যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. কাজটা যত জটিল হবে ভেবেছিলাম 2

২. অরুণের বিয়ে হচ্ছে 17

৩. আমি বাথরুম সারলাম 36

৪. চুক চুক শব্দ হচ্ছে 49

১. কাজটা যত জটিল হবে ভেবেছিলাম

কাজটা যত জটিল হবে ভেবেছিলাম ততটা জটিল হলো না।

কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই কাজ শেষ হলো। ঘড়িতে এখন বাজছে আটটা কুড়ি মিনিট। শুরু করেছিলাম আটটা পাচে। পনেরো মিনিট সময় লাগল। জলজ্যান্ত একটা মানুষ পনেরো মিনিটে মেরে ফেলা সহজ ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়। কঠিন ব্যাপার। তবে রুবা নিজেই ব্যাপারটা আমার জন্যে সহজ করে দিয়েছে।

আজ আমাদের একটা বিয়ের দাওয়াতে যাবার কথা ছিল। রুবার সাজগোজ শুরু হলো বিকেল থেকে। শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। পছন্দ হয় না, আবার বদলায়। আমাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করল কেমন দেখাচ্ছে। আমি প্রতিবারই বললাম–খুব সুন্দর লাগছে। আসলেই সুন্দর লাগছিল। শেষ পর্যন্ত বেগুনি রং একটা শাড়ি তার পছন্দ গুলো। সেই শাড়ি পরার পর দেখা গেল, চায়ের দাগের মতো কী একটা দাগ লেগে আছে। কিছুতেই সেই দাগ আড়াল করা যাচ্ছে না। সে ঠিক করল বিয়েতে যাবে না। রুবাব মাথা ধরল। তখন। শাড়িতে দাগ পাওয়া না গেলে মাথা ধরত না। আমাদের বিয়েবাড়িতে যাওয়া বাতিল হতো না। আমার কাজটা পিছিয়ে যেত।

রুবা মুখ শুকনো করে বসে বইল বাবান্দায়।

আমি বললাম, দুটা সিডাকসিন খেয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাক। মাথাধরা সেরে যাবে। দুটা সিডাকসিন একটা প্যারাসিটামল। সে বাধ্য মেয়ের মতো তাই করল। ঘরে প্যারাসিটামল ছিল না। আমিই ডিসপেনসারি থেকে এনেছিলাম। সে ওষুধ খেয়ে লম্বা হয়ে

শুয়ে পড়ল। আমি বললাম, মাথা টিপে দেব? সে বলল, দাও। আমি বসলাম তার মাথাব পাশে। সে ঘুমিয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। এখন আমার কাজ হচ্ছে বালিশটা মুখেব উপর চেপে ধরা। এই কাজটা পায়ের দিকে বসে কখনো করতে নেই। সম্ভাবনা শতকরা একশ ভাগ, জীবন বাঁচানোর জন্যে শেষ মুহুর্তে প্রচণ্ড লাথি বসাবে। কাজেই বালিশ দিয়ে মুখ চেপে ধরার আগে বসার জায়গাটা ঠিক করে রাখতে হবে। সবচে ভালো হয় কাজটা যদি দাঁড়িয়ে করা যায়। দাঁড়িয়ে থেকে যতটা চাপ মুখের উপর দেয়া যাবে বসে থেকে ততটা দেয়া যাবে না। তারপরেও সম্ভাবনা থাকে যে, ভিকটিমা হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে মুক্ত করে নেবে। একবার যদি কোনোক্রমে নিঃশ্বাস নিয়ে ফেলতে পারে তাহলেই সর্বনাশ। বুদ্ধিমানরা সেদিকটা খেয়াল রেখে অন্য ব্যবস্থাও হাতেব কাছে রাখেন, যাকে বলে ব্যাক আপ সিস্টেম। আমিও বেখেছিলাম। তার প্রয়োজন পড়ে নি। ঐ তো রুবা আড়াআড়িভাবে বিছানায় পড়ে আছে। চোখ খোলা, যে কেউ দেখলে ভাবাবে শুয়ে আছে। আজ তার পা এত বেশি ফর্সা লাগছে কেন? টিউব লাইটের জন্যে? নাকি মৃত্যুর পর পর মানুষ ফর্সা হতে শুরু করে? এ ব্যাপারটা আমার জানা নেই। তবে মৃত্যুর পর পর রিগোরাস মার্টিস বলে একটা ব্যাপার হয়, শরীরের মাংসপেশি শক্ত হতে শুরু করে। সেটাও এত চট করে হবে না। সময় লাগবে।

আমি উঠে গিয়ে ওর শাড়ি ঠিক করে দিলাম। মাথার নিচে বালিশ দিয়ে গায়ে চাদর টেনে দিলাম। একটা হাত কোলবালিশের উপর দিয়ে দিলাম। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে ভাববে, ঘুমুচ্ছে। তবে তার শোয়াটা ঠিক হয় নি। সরোজিনি শুয়ে আছে জানি না সে শুয়ে আছে কিনা। কার কবিতা যেন এটা? যারই হোক, এখন কবিতার সময় নয়। কবিতা আজকে তোমায় দিলাম ছুটি। এটা কার, সুকান্তের?

আমি বিছানায় বসলাম। মাথা খানিকটা এলোমেলো লাগছে। এলোমেলো লাগছে। বলেই কবিতার লাইন মনে আসছে। একটু বোধহয় রেস্ট দরকার। কাবার্ডে ব্রান্ডির একটা বোতল আছে। আমার না, রুবার। তার শরীর খুব খারাপ করল, তখন ডাক্তার তাকে খেতে দিল। তারপর কার কাছে যেন শুনল ব্রান্ডি হচ্ছে কড়া ধরনের মদ–ব্যস, খাওয়া বন্ধ। বোতলের পুরোটাই আছে, খানিকটা গলায় ঢেলে দিলে এলোমেলো ভাব কাটবে। আমি কাবার্ডের দিকে যেতে গিয়েও গেলাম না। এলকোহল যা করবে তা হলো সাময়িক কিছু শক্তি। তারপরই আসবে অবসাদ। I can not take any chance... কোনো চান্স নেয়া যাবে না। এখনো প্রচুর কাজ বাকি আছে।

একটা মানুষ মারা তেমন কোনো জটিল ব্যাপার না। ডেডবডি গতি করাই হচ্ছে সবচে জটিল কাজ। তবে সব ব্যবস্থা করা আছে। আমি হুঁট কবে কিছু করি না, যা করি ভেবে-চিন্তে করি। রুবাকে কী কবে মারব তা নিয়ে আমি খুব কম হলেও এক মাস ভেবেছি। তার ডেডবডি কী করে সরাব তা নিয়ে ভেবেছি প্রায় এক বছর। অধিকাংশ খুনী ধরা পড়ে ডেডবডি সরাতে গিয়ে। খুনের পরে পরেই এক ধরনের ল্যাথার্জি এসে যায়। নার্ভ ফেল করে। তখন খুব তাড়াহুড়া করতে ইচ্ছা করে। স্বামী হয়তো স্ত্রীকে গল। টিপে মারল– মানুষের কাছে প্রমাণ করতে চায়, ফাস নিয়ে মরেছে। ডেডবডি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল, কিন্তু দড়ির গিটটা দিল ঘাড়ের দিকে। সে ভুলে গেছে একজন মানুষ ফাস নেবাব সময় দড়ির গিট ঘাড়ের কাছে দেবে না। হাত পেছন দিকে নিয়ে গিট দেয়া খুব মুশকিল। সত্যিকার ফাঁসির আসামির গিট থাকবে সামনের দিকে।

অনেকে আবার খুন করার পর ডেডবডির মুখে খানিকটা বিষ ঢেলে দেয়। হাতের কাছে যা পায় তাই। ইদুর-মারা বিষ র্যাটম, তেলাপোকা মারাব বিষ রোঢ়কিলার। এরা একটা

জিনিস জানে না যে সুরতহালের সময় মুখে কী বিষ আছে তা দেখা হয় না। ভিসেরার বিষ পরীক্ষা করা হয়। সবকিছু ঠিকঠাক মতো করে শেষে ফেসে যায়। যাকে বলে তীরে এসে তরী ডুবা। আমার সেই ভয় নেই। আমি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত মেথডিকাল। একাউন্টেন্টরা সাধারণত মেথডিকাল হয়ে থাকে।

আমি সিগারেট খাই না। কিন্তু আজকের দিনের জন্য একটা সিগারেট কিনে রেখেছিলাম। বেনসন এন্ড হেজেস। সিগারেট ধরলাম। না, হাত কাঁপছে না। হাত স্থির আছে। তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। ফ্রিজ খুলে হিম-শীতল এক গ্লাস পানি খেলাম। যদিও ঠাণ্ডা পানি খাওয়া আমার জন্যে নিষিদ্ধ। আমার টনসিলাইটিসের সমস্যা আছে। ঠাণ্ডা কিছু খেলেই গলা খুস খুস করতে থাকে। প্রথমে খুস খুস, তারপর কাশি। কয়েক দিন কাশি হবার পর গলা বসে যায়। কথা বলতে হয়। হাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাসে গলায়।

টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন ধরাটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। প্রথম কথা, এই টেলিফোন আমার জন্যে বাজছে না। আমাকে কেউ টেলিফোন করে না। আমিও করি না। নিশ্চয়ই রুবার টেলিফোন। তার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা কত তা সে নিজেও বোধহয় জানে না। এরা সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা সব সময় টেলিফোন করছে। এর মধ্যে একজন আছে যে রাত বারটার পর টেলিফোন করে। মিতা কিংবা রীতা বোধহয় নাম। ঐ মেয়েটা চাকর-বাকরের সমস্যা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা বলে না। এবং রুবা এমন আগ্রহ নিয়ে শুনে যে মনে হয় কোনো ঐশীবাণী শুনছে।

টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে। আমি উঠে টেলিফোন ধবলাম। হ্যালো বলার আগেই ওপাশ থেকে বলল, রুবা ভাবিকে একটু দিন তো। সে বুঝল কী করে যে রুবা টেলিফোন ধরে

নি, আমি ধরেছি? টেলিফোনের ব্যাপারে ওদের সিক্সথ সেন্স সম্ভবত খুব প্রবল। অল্প বয়েসী মেয়ের গলা। আমার সঙ্গে আগে কখনো কথা হয় নি। আমি অনায়াসে বলতে পারতাম, রং নাম্বার। সেটা বললে ভুল করা হতো। কারণ ঐ মেয়ে আবার টেলিফোন করত। মেয়েদের ধৈর্য সীমাহীন। একই নাম্বারে এক লক্ষবার টেলিফোন করেও তারা ক্লান্ত হয় না।

হ্যালো, রুবা ভাবি কি বাসায় নেই?

আছে, বাসায় আছে।

উনাকে কাইন্ডলি একটু ডেকে দিন। বলুন লীনা টেলিফোন করেছে।

ও তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ওর শরীরটা খারাপ। মাথা ধবেছিল। একটা প্যারাসিটামল আর দুটা সিডাকসিন খেয়ে শুয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে।

উনার সঙ্গে খুব দরকার ছিল।

খুব দরকার থাকলে ডেকে দেই? অবশ্যি এইমাত্র ঘুমিয়েছে, ডাকলে রেগে যেতে পাবে। ডাকব?

না থাক।

জরুরি কিছু থাকলে আমাকে বললে আমি ওকে বলতে পারি।

আপনি কি মিজান ভাই?

হ্যাঁ।

স্লামালিকুম মিজান ভাই।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আপনি কি আমাকে চিনেছেন? আমি বেনুর ছোটবোন। আমার নাম লীনা।

ও আচ্ছা, লীনা।

আমি কিছুই চিনলাম না। তবু আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসলাম। হাসতে হাসতেই বললাম, জরুরি খবরটা কী এখন শুনি। অবশ্যি আমাকে যদি বলা যায়।

রুবা ভাবির জন্যে দুটা কাজের মেয়ে জোগাড় করে ফেলেছি।

বলো কী? এক সঙ্গে দুটা?

মিরাকল বলতে পারেন। দুটা মেয়েই ভালো। একজন মিডল এজ, ধরুন, থার্টি ফাইভ হবে; আরেকটা বাচ্চা মেয়ে, বয়স চৌদ্দ-পনেরো হবে। ভালনারেবল এজ। এই বয়েসের মেয়েরাই নানান সমস্যার সৃষ্টি করে। তবে মেয়েটা খুব কাজের। নাম রেশমা। ওর লাইফে একটা খারাপ ইনসিডেন্ট আছে। সেটা আপনাকে বলা সম্ভব না। রুবা ভাবিকে বলব। আপনি উনার কাছ থেকে শুনে নেবেন.

আমি টেলিফোন কানে ধরে বসে আছি। লীনা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। কোনো দ্বিধা নেই, কোনো সংকোচ নেই। আশ্চর্য কাণ্ড!

টেলিফোনে কথা বলার বিশ্রী রোগ কোনো কোনো মেয়ের থাকে। এরও নিশ্চয়ই আছে। সহজে টেলিফোন ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

হ্যালো, মিজান ভাই?

শুনছি।

রুবা আপাকে মেয়ে দুটার কথা বলবেন।

অবশ্যই বলব। ঘুম ভাঙলেই বলব। ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে তো, কিছুক্ষণের মধ্যেই জেগে উঠবে বলে আমার ধারণা।

ঘুম ভাঙলে আমাকে টেলিফোন করতে বলবেন। যত রাতেই হোক। আচ্ছা আমি বলব। আর রুবা ভাবিকে বলবেন সে যেন ঘুমের ওষুধ-টষুধ কম খায়। আমি বললে কি আর

শুনবে! তবু বলব। মিজান ভাই, আপনি ঘুমুতে যান কখন? আমার দেরি হয়। বারটা সাড়ে বারটা বেজে যায়। সাড়ে বারটা কোনো রাত হলো? আমি ঘুমুতে যাই কখন জানেন? কোনো দিনও

দুটার আগে না। গতকাল ঘুমুতে গেছি বাত তিনটায়। আমার ইনসমনিয়া আছে তো, প্রায়ই ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ আপনার সঙ্গে বকবক কবলাম। আপনি রাগ কবেন নি তো?

না। আমি রাগ করতে পারি না।

রাখি মিজান ভাই?

আচ্ছা।

রুবা ভাবিকে আপনি কিন্তু মনে করে বলবেন। ভুলে যাবেন না। আবার।

ভুলব না।

খোদা হাফেজ।

খোদা হাফেজ লীনা। Sweet Dreams.

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। কাঁটায় কাঁটায় এগারো মিনিট কথা বলছি। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। সহজভাবে কথা বলতে পেরে ভালো লেগেছে। বুঝতে পারছি, আমার স্নায়ু ঠিক আছে। ১৯-এর ঘরের নামতা কি বলতে পারব? ১৯ একে ১৯, ১৯ দুকুনে

৩৮, তিনি ১৯-এ ৫৭, সাতান্ন না। আটান্ন? বাথরুমে যাওয়া দরকার। আমার যে প্রচণ্ড বাথরুম পেয়েছে এটা এতক্ষণ বুঝি নি। এখন বুঝতে পারছি। যে-কোনো বড় কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাংসপেশি খানিকটা শিথিল হয়ে যায়। তখন প্রচণ্ড বাথরুম পায়।

জ্যাক দি রিপারের কাহিনীতে পড়েছি–সে এক একটা খুন করত। খুন। শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়েই প্রস্রাব করে ফেলত। প্যান্টেবজিপার খোলারও সময় পেত না।

আমি বাথরুমে ঢুকলাম। সুন্দর বাথরুম, ঝকঝাক তকতক করছে। রুবার বাথরুম গোছানো রোগ আছে। তার বাথরুম থাকতে হবে ঝকঝকে। বাথরুমের মেঝে ভেজা থাকলে চলবে না। মেঝে থাকবে খটখাটে শুকনো। গোসলের পানি যা পড়বে তা পড়তে হবে বাথ ট্রেতে। বাথ ট্রের বাইরে এক ফোঁটা পানিও পড়তে পারবে না।

বাথরুমের বাতি জ্বালালাম। আয়নায় একটা নোটিশ ঝুলছে

ছোট বাথরুম করার আগে দয়া করে
কমোডের ঢাকনা তুলে রাখবেন।

আমি তাই করলাম। রুবা বেঁচে নেই তাতে কী হয়েছে! ওর কথা শুনতে আপত্তি কী? তিনি ১৯-এ কত? ৫৭ না ৫৮? তিন নয়। সাতাশের সাত। হাতে রইল দুই। তিন একে তিন আর দুই পাঁচ...।

মাথা থেকে নামতা ঝেড়ে ফেললাম। বাতি নিভিয়ে বাথরুম থেকে বের হয়ে এলাম। এখন আমার যা দরকার তা হলো গরম এক কাপ কফি। কফি খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা করে

শ্বশুরবাড়িতে একটা টেলিফোন করতে হবে। চিন্তিত গলায় বলতে হবেরুবা কি আপনাদের ওখানে গেছে? ও-বাড়ির কেউ তেমন চিন্তিত হবে না। কারণ রুবা প্রতি মাসে কয়েকবার রাগ করে বাসা ছেড়ে চলে যায়। কখনো তার মার কাছে গিয়ে থাকে, কখনো তার বোনের বাসায় গিয়ে উঠে। মাঝে মাঝে চলে যায়। তার বন্ধু-বান্ধবদের বাসায়।

কফির জন্যে পানি গরম করতে দিলাম। আমাদের রান্নাঘরও বাথরুমের মতোই ঝকঝকে পরিষ্কার। এক কণা ধূলি নেই, তেলের ছোপ নেই। কিচেন ক্যাবিনেটে সুন্দর করে থরে থরে বোতল সাজানো। প্রতিটি বোতলের গায়ে আবার লেবেল লাগানোচিনি, লবণ, হলুদ, মরিচ, গরাম মশল্লা.। রুবা খুব গোছানো মেয়ে ছিল, এটা স্বীকার করতেই হবে। গত একমাস হবে আমাদের কোনো কাজের লোক নেই, এতে কোনো সমস্যাই হচ্ছে না। বরং লাভ হয়ে গেল আমার। কাজের লোক থাকলে হত্যা পরিকল্পনা রদবদল করতে হতো। তাকে ছুটি দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিতে হতো বা এরকম কিছু করতে হতো। অবশ্যি এতে তেমন ঝামেলা কিছু হতো না। পরিস্থিতি বুঝে পরিকল্পনা। যে কারণে ফ্লাট বাড়ি ছেড়ে আলাদা একতলা বাড়ি নিলাম। ফ্লাট বাড়ি থেকে একটা ডেডবডি বের করে নেয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আর এখানে কোনো ব্যাপারই না। গাড়িবারান্দার বাতি নেভানো থাকবে। গাড়ির দরজা থাকবে খোলা। আমি রুবাকে বড় একটা চাদরে মুড়ে গাড়িতে ঢুকিয়ে দেব।

পানি ফুটছে। কফির ঝামেলায় গেলাম না। আমি কফি ঠিকমতো বানাতে পারি না। তেতো হয়ে যায়। এই মুহুর্তে তেতো কফি খেতে ভালো লাগবে না। এরচে চা বানানো সহজ। একটা টি-ব্যাগ ফেলে দেয়া। চায়ের কাপ হাতে নিয়েই আমি টেলিফোন করতে গেলাম। আমার শাশুড়ি টেলিফোন ধরলেন। আমি বললাম, মা, কেমন আছেন?

তিনি বললেন, ভালো আছি বাবা।

আপনার পিঠের ব্যথা কমেছে?

ব্যথাটা কমেছে, অবশ্যি জ্বর এখনো আছে।

মা, খাওয়া-দাওয়া কী করছেন?

দুপুরে কিছু খাই নি।

কিছু একটা খাওয়া তো দরকার মা–উপোস করা ঠিক না।

কিছু খেতে ইচ্ছা করে না।

আপনার খোঁজ নেয়ার জন্যেই টেলিফোন করলাম মা।

তা তো বাবা করবেই। আমার খোঁজ-খবর যা করার তা তো তুমিই কর। তুমি যা করা কোনো মায়ের পেটের সন্তান তা করবে না।

ছি ছি মা, আমি আবার কী করলাম?

সেই কবে কথায় কথায় খেজুর গুড়ের সন্দেশের কথা বলেছিলাম। তুমি ঠিকই মনে রেখেছি। এ ক গাদা সন্দেশ পাঠিয়েছ। তা বাবা, সন্দেশ খাওয়ার বয়স কি এখন আছে?

ঐসব কথা বাদ দিন তো মা?

আচ্ছা বাবা, যাও বাদ দিলাম। রুবা কেমন আছে? ওর কি দিনে একবার মাকে টেলিফোন করতেও ভালো লাগে না?

ও সা সময় বলে আপনার কথা।

থাক বাবা। থাক। আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার দরকার নেই। আমার নিজের পেটেরই তো মেয়ে। আমি জানি না। ওরা কেমন?

ইয়ে মা, রুবা আপনার ওখানে যায় নি? আমি ভাবছিলাম...

ও কি আবার রাগ করে চলে গেছে?

জি।

তুমি ওকে কিছু বলে না কেন? তুমি কিছুই বলো না। এতে সে আরো লাই পেয়ে গেছে। বাবা তুমি শক্ত হও।

আমি হাসলাম। আমার শাশুড়ি এতে রেগে গেলেন। বিরক্ত গলায় বললেন, হাসছ কেন? হসবে না। আমি আমার মেয়েদের নাড়ি-নক্ষত্র চিনি। এরা জানে শুধু যন্ত্রণা দিতে। তোমাকে ভালো মানুষ পেয়ে...

বাদ দিন মা।

কিছু একটা হলেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। এসব কী? বেশি স্বাধীনতা ভালো না। তুমি স্বাধীনতা বেশি দিয়ে ফেলেছ?

থাক মা, আপনি এটা নিয়ে ওকে কিছু বলতে যাবেন না। ও যদি টেলিফোন করে তাহলে বলবেন, ঘরের আলিমিরার চাবি নিয়ে গেছে, আমি কাপড়-চোপড় বের করতে পারছি না। অরুণের বিয়েতে যাবার কথা। মনে হচ্ছে অফিসের কাপড় পরেই যেতে হবে। যেতে অবশ্যি ইচ্ছা করছে না...

না, না, তুমি যাও। অরুণ আমাদেরকেও কার্ড দিয়ে গেছে। আমি পিঠে ব্যথা নিয়ে যাই কীভাবে? তোমার শ্বশুর সাহেবকে যেতে বলছি, দেখি যায় কি না। রুবার ব্যবহারে তুমি কিছু মনে করো না বাবা। তুমি বিয়েতে যাও। তোমার এতদিনের বন্ধু, না গেলে মনে কষ্ট পাবে।

আচ্ছা মা, আপনি যখন বলছেন যাব। সমস্যা হচ্ছে গিফট যেটা কিনেছিলাম সেটাও রুবা আলমিরায় ঢুকিয়ে রেখেছে। ভুল করে রেখেছে বোধহয়।

মোটেই ভুল করে রাখে নি। এই কাজটা সে ইচ্ছা করেই করেছে। তোমাকে সমস্যায় ফেলা, আর কিছু না। বাবা, তুমি দেরি করো না, চলে যাও?

আমি টেলিফোন নামিয়ে আবার শোবার ঘরে এলাম। রুবা শুয়ে আছে। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে বলেই কিছু কিছু চুল উড়ছে। সবই স্বাভাবিক। শুধু মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে আছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিহবার খানিকটা অংশ বের হয়ে আছে। মৃত্যুর পরপর মানুষের জিহবা

কি খানিকটা লম্বা হয়ে যায়? রুবার শাড়ির আঁচলে একটা তেলাপোকা বসে আছে। এরা কি টের পেয়ে গেছে? বুঝে গেছে যে এই মেয়েটা বেঁচে নেই? তেলাপোকা যখন খবর পেয়েছে তখন পিপড়ারাও খবর পাবে। সারি বেঁধে আসতে শুরু করবে। নকোব ফুটো, কানের ফুটো দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে। একটা ব্যবস্থা নেয়া উচিত। খানিকটা মটিন ছড়িয়ে দিলে হয়।

এ বাসায় মর্টিন, এরোসল, এয়ার ফ্রেশনার সবই আছে, শুধু খুঁজে বের করাই হলো সমস্যা।

ওয়াস বেসিনের নিচেই এরোসল পাওয়া গেল! একগাদা এরোসল প্রে করলাম রুবার গায়ে। তেলাপোকাটা বিস্মিত হয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে। শুঁড় নাড়ছে।

আমি আয়নার সামনে চলে গেলাম। বিয়েতে যেতে হবে। প্রতিটি কাজকর্ম খুব স্বাভাবিকভাবে করতে হবে। কেউ যেন কিছুই সন্দেহ করতে না পারে। আয়নায় নিজের চেহারায় আমি তেমন কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। একটু ক্লান্ত ভাব আছে, এর বেশি কিছু না। কেউ দেখে বুঝতে পারবে না যে আমি কিছুক্ষণ আগে একটা খুন করেছি।

ঘর থেকে বের হবার আগে রুবাকে পাশ ফিরিয়ে দিলাম। হাঁ করা মুখ দেখতে ভালো লাগছে না। তার শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা হয় কী করে? ঘরের যে তাপ সেই তাপই তো থাকার কথা। এর চেয়ে ঠাণ্ডা হবার তো কথা না। হাত-পাও শক্ত হয়ে গেছে। রিগরাস মার্টিস শুরু হয়েছে। দাওয়াত থেকে ফিরে এসে ডেডবিডি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। কী করব। সব ঠিক করা আছে। কোনো সমস্যা হবে না।

বাতি নিভিয়ে ঘর থেকে বের হলাম। বাইরে তালা লাগিয়ে দিলাম। ঘড়িতে এখন বাজছে নটা। নভেম্বর মাসের শেষ, শীত লাগছে। গরম কাপড় আনা উচিত ছিল। দিনের বেলা বেশ গরম ছিল। বাংলাদেশের আবহাওয়া কী হচ্ছে কে জানে? ওজোন লেয়ারের গণ্ডগোলে সব মনে হয় ওলট-পালট হয়ে গেছে। কিছুদিন পর হয়তো দেখা যাবে শীতকালে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। গরমকালে শীতে লোকজন ঠক ঠক করে কাঁপছে।

২. অরুণের বিয়ে হচ্ছে

অরুণের বিয়ে হচ্ছে সোহাগ কম্যুনিটি সেন্টারে। অরুণ হলো আমার স্কুল জীবনের বন্ধু। বন্ধু বললে বাড়িয়ে বলা হয়–স্কুলে আমি ওর সঙ্গে পড়েছি। অরুণের ধারণা, আমি ওর জন্যে খুব ব্যস্ত। এবং আমাদের বন্ধুত্ব আরসিসি কনক্রিটের মতো। সে কদিন পরপরই অফিসে টেলিফোন করে আন্তরিক ধরনের একটা স্বর বের করে বলে–দোস্ত, তোর কোনো খোঁজ নাই, খবর নাই। ব্যাপারটা কী?

বাসায় যখন তখন আসে, ভাবি ভাবি বলে সরাসরি বেডরুমে ঢুকে যায়। তার বোধহয় ধারণা, আন্তরিকতা দেখানোর প্রধান শর্ত হলো বেডরুমের বিছানায় পা এলিয়ে বসে গল্প।

অরুণের ওস্তাদী ধরনের আলাপ আমার সব সময় অসহ্য বোধ হয়। উপায় নেই বলেই সহ্য করে নেই। অরুণটা গাধা ধরনের, আমি যে তাকে দু চোখে দেখতে পারি না এতা সে জানে না।

কম্যুনিটি সেন্টারে পৌঁছে দেখি, দুটা ব্যাচের খাওয়া হয়ে গেছে। তাবপরেও লোকজন যা আছে, মনে হচ্ছে আরো চার-পাঁচ ব্যাচ খাবে। অরুণ আমাকে বলল, তুই গাধার মতো এত দেরি করলি? আশ্চর্য, সামান্য সেন্সও তোর নেই? ছাগল কোথাকব! বউ আসে নি?

আমি কিছু বললাম না, হাসলাম।

অরুণ বলল, আবার ঝগড়া? আমার বিয়ের দিনটায় বেছে বেছে ঝগড়া করলি?

মাফ করে দে।

যা, খেতে বোস। তোর শ্বশুর এসেছেন, তোকে খুঁজছেন।

কেন?

কে জানে কেন। তুই খেতে বোস। সবাই যে হারে খাচ্ছে খাওয়া শর্ট পড়ে যাবে। দেরি করলে কিছুই পাবি না। ভিডিও হচ্ছে বুঝলি। মনে করে তোর ভাবির সঙ্গে ছবি তুলিস। একটা রেকর্ড থাকুক।

আমি খেতে বসে গেলাম। এতটা খিদে লেগেছে নিজেও বুঝি নি। রান্না ভালো হয়েছে। অনেকেই দেখি চেয়ে চেয়ে ডাবল রোস্ট নিচ্ছে। আমিও নিলাম। পোলাও বোধহয় নতুন করে রান্না হয়েছে। আগুন-গরম। খাসির রেজালা থেকে চমৎকার গন্ধ আসছে।

এই যে মিজান!

তাকিয়ে দেখি আমার শ্বশুর সাহেব। আমার শ্বশুর সাহেব বিয়ে করার পর হারে বুড়ো হতে শুরু করেছেন। রোজ অনেকখানি করে বুড়ো হন। বিয়ে উপলক্ষ্যে তিনি একটা কালো আচকান পরেছেন। সম্ভবত এই জিনিস যৌবনকালে বানিয়েছেন। আচকানও তাঁর মতো বুড়ো হয়েছে। বেচারাকে দেখাচ্ছে সার্কাসের লোম ওঠা ভালুকের মতো। আমি তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালাম। উনি হৈ হৈ করে উঠলেন, দাঁড়াচ্ছ কেন? বোস বোস। রুবা বাসায় আছে এই খবরটা তোমাকে জানাতে বলল তোমার শাশুড়ি।

কে বাসায় ফিরেছে?

রুবা।

তোমার শাশুড়ি তোমার বাসায় টেলিফোন করেছিল। সে ধরল। সে নাকি বাসাতেই ছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল। তুমি তাকে রেখে চলে এসেছ, এই নিয়ে মন খারাপ করেছে।

আমি বুড়োর দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। গাধাটা এইসব কী বলছে? বুড়ো ভালুকের মাথায় নাট বল্টু কি খুলে পড়ে গেছে? কোথায় না কোথায় রং নাম্বার করেছে... ..আমি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লাম। আমার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি হাত ধুচ্ছি, অরুণ ছুটে এসে বলল, ব্যাপার কিরে, খাওয়া শেষ?

হুঁ।

খাওয়া কেমন হয়েছে?

ভালো। খুব ভালো।

পোলাও শর্ট পড়ে গিয়েছিল। নতুন করে রাঁধতে হলো। অন্য মানুষদের বিয়েতে গোশত শর্ট পড়ে, রোস্ট থাকে না, রেজালা থাকে না–আমার বেলায় শর্ট পড়ল পোলাও। হাউ ষ্ট্রেঞ্জ।

দোস্ত যাই।

যাই মানে? হোয়াট ডু ইউ মীন বাই যাই? তোর ভাবির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না।

যা, দেখা কর। ভিডিওওয়ালাকে বলে দিচ্ছি, ভিডিও করবে।

বাসায় যাওয়া দরকার, রুবার জন্যে চিন্তা লাগছে।

খামাখা চিন্তা করবি না। আয় তো আমার সঙ্গে, তোর ভাবির সাথে আলাপ করিয়ে দেই।

আজকালকার বৌরা আগের দিনের মতো না, জবুথবু হয়ে লম্বা ঘোমটা টেনে বসে থাকে না। এরা হড়বড় করে কথা বলে, বিনা কারণেই হিস্টিরিয়া রোগীর মতো হাসে। অরুণের বৌয়ের হাসি শোনার সময় এখন নেই। আমাকে বাসায় যেতে হবে। এমনভাবে যেতে হবে যেন কারো চোখে কোনো অস্বাভাবিকতা ধরা না পড়ে।

বাসায় ফিরলাম রাত দশটায়। আশ্চর্য কাণ্ড! শোবার ঘরে বাতি জ্বলছে। এর মানে কী? আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি বাতি নিভিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি। ধ্বক করে বুকে একটা ধাক্কা লাগল। চাবি হাতে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। পায়ের শব্দ পাচ্ছি। ঘরের ভেতর চটি পায়ে কেউ একজন হাঁটছে। নিশ্চয়ই মনের ভুল। বাতিটাও কি মনের ভুল? হয়তো আমি ভুল করে বাতি জ্বলিয়েই এসেছি। পুরো ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে। খুব ঠাণ্ডা মাথায়। বোঝাই যাচ্ছে আমার স্নায়ু উত্তেজিত। মাথায় হয়তো রক্ত

উঠে গেছে। আমার শ্বশুর সাহেবই বা এটা কী বললেন? সব কিছুর একটা লজিকেল এক্সপ্ল্যানেশন থাকে। এরও নিশ্চয়ই আছে।

আমি দরজা না খুলে রাস্তার দিকে রওনা হলাম। মোড়ে একটা চায়ের দোকান আছে। এক কাপ চা খাব। একটা সিগারেট খাব। পানও খাওয়া যেতে পারে। এই ফাকে চিন্তা করে বের করব।–হচ্ছেটা কী? ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে। ছয়-এর সঙ্গে এক যোগ করলে তবেই সাত হয়–আপনা। আপনি সাত হয় না।

চা খেতে খেতে আমি ব্যাপারটা কী ঘটেছে তার একটা গ্রহণযোগ্য সিনারিও তৈরি করলাম।

আমার শাশুড়ি পিঠের ব্যথায় ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়েছিলেন। তার হাতের কাছেই টেলিফোন। তিনি পিঠের ব্যথার জন্য কড়া ধরনের সিডেটিভ খান। কাজেই তাঁর আধোঘুম আধো-জাগরণ অবস্থা। এই অবস্থায় টেলিফোন বাজল। তিনি টেলিফোন ধরার জন্য হাত বাড়ালেন এবং টেলিফোন ধরার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন। রুবার সঙ্গে কথাবার্তার অংশটি তিনি স্বপ্নে দেখলেন। স্বপ্নটা তাঁর অবচেতন মন তাকে দেখাল। স্বপ্ন ভাঙার পর স্বপ্নটাকেই তার সত্যি মনে হতে লাগল। আমার শ্বশুর সাহেব তখন বেরুচ্ছেন। তাকে তিনি রুবার কথাটা বলে দিলেন। সত্যি ভেবেই বললেন। এই হচ্ছে ব্যাপার।

একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো গেছে, এতেই আনন্দিত বোধ করছি। নিশ্চিন্ত বোধ করছি। একটা ব্যাখ্যা যখন দাঁড় করানো গেছে, আরো ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই দাঁড় করানো যাবে।

আমি পান মুখে দিয়ে ফিরে এলাম। তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম। কেন জানি ইচ্ছা! করল। দরজাটা খোলা রাখতে। পর মুহুর্তে মনে হলো, এতো বড় বোকামি কখনোই করা ঠিক

হবে না। দরজার দুটা ছিটিকিনিই বন্ধ কাবলাম। ডেডবডি সবাবার কাজ এখন শুরু করতে হবে। আমি শোবার ঘরে ঢুকলাম। রুবা ঠিক আগের ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। শুধুশুধুই একটা আজে-বাজে ধরনের ভয়ে এতক্ষণ কুঁকড়ে ছিলাম।

ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়েছি বলেই বোধহয় ঘবটা গুমটি হয়ে আছে। ফ্যান ছাড়লাম। বাতাসে রুবার মাথার চুল উড়ছে। সেই চুলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভয়াবহ ধরনের চমক খেলাম। রুবা তো এভাবে শুয়ে ছিল না। আমি তার মুখ দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। সে পাশ ফিরল কীভাবে? তার চোখও খোলা। চোখ তো বন্ধ ছিল। চোখ খোলা হলেও এই চোখ জীবিত মানুষের নয়। চোখে পলক পড়ছে না। রুবা পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। না না, মেঝের দিকে না। সে তো আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। একটু আগেই তো দেখেছি মেঝের দিকে তাকিয়েছিল। Something is wrong. Something is very very very wrong. গরম লাগছে। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। আমি কি ভয় পাচ্ছি? মানুষেবা ভয় পাওয়ার একটা শেষ সীমা আছে। আমি কি সীমা অতিক্রম করতে যাচ্ছি?

হে মানব সন্তান।
তুমি সীমা অতিক্রম করিও না।
সীমা অতিক্রমকারীকে আমি পছন্দ করি না।

এইগুলি কার কথা? কোরান শরীফের? কোন সূরায় আছে?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

নিঃশ্বাস ফেলার মতো শব্দ হলো। কে নিঃশ্বাস ফেলল? রুবা? মৃত মানুষ কখনোই নিঃশ্বাস ফেলে না। আমি যা শুনছি তা আমার নিজেরই নিঃশ্বাসের শব্দ। কিংবা বাতাসের শব্দ। কিংবা...। আমি নিজের অজান্তেই ডাকলাম, রুবা!

সঙ্গে সঙ্গে কেউ একজন বলল, উঁ।

না না, রুবা এটা বলতেই পারে না। ঐ তো তার মুখ হাঁ হয়ে আছে। জিহবা খানিকটা বের হয়ে আছে। পলকহীন চোখে সে তাকিয়ে আছে। মৃত মানুষ কথা বলে না। বাতাসের শব্দই আমার কাছে উ ধ্বনির মতো মনে হয়েছে। আমার মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে। আমাকে যা করতে হবে তা হলো–এই ঘর থেকে বের হয়ে যেতে হবে। স্নায়ু ঠাণ্ডা করতে হবে। কাবার্ডে ব্রান্ডি আছে। সামান্য ব্রান্ডি খাব, তারপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মাথাটা ধুয়ে ফেলব। আমার মস্তিষ্ক মনে হয় অক্সিজেন কম পাচ্ছে। অক্সিজেন কম পেলে মানুষ হেলুসিনেশন দেখতে শুরু করে।

ঘর থেকে বেরুবার আগে আরেকবার ভালোমতে রুবার দিকে তোকালাম। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিলাম। প্রচুর অক্সিজেন নিতে হবে। ব্রেইনের যেন অক্সিজেনের অভাব না হয়।

আমি বসার ঘরের দিকে রওনা হতেই স্পষ্ট শুনলাম, কেউ যেন পাশ ফিরল। খাট মট মট কবে উঠল। নিঃশ্বাস ফেলাব শব্দও যেন হলো।

কেউ কি থুথু ফেলেছে? একটু থু শব্দ যেন শুনলাম।

আমি বসার ঘরে চলে এলাম। চায়ের কাপোব আধিকাপ ব্রান্ডি একসঙ্গে গলায় ঢেলে দিলাম। তীব্র, ঝাধালো স্বাদ! মনে হচ্ছে শরীরের সমস্ত স্নায়ু পুড়িয়ে তরল আগুন নিচের দিকে নামছে। ভয়টা কমে গেছে। জিনিসটা আরো। আগেই খাওয়া উচিত ছিল। আমি জানি, এখন যদি শোবার ঘরে যাই, দেখব, সব স্বাভাবিক। রুবার মুখ দেয়ালের দিকে ফেব্যানো, চোখ বন্ধ। বাথরুমে ঢুকে মাথায় পানি ঢালিলাম। কাজটা বোকার মতো হয়ে গেল। আমার টনসিলাইটিসেব সমস্যা। ঠাণ্ড লেগে বিশ্রী ব্যাপার হবে।

টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন বাজছে শোবার ঘর থেকে। এর মানে কী? টেলিফোন বসার ঘরে ছিল। তার টেনে শোবার ঘরে কে নিয়ে গেছে? না না এত অস্থির হবার কিছু নেই, নিশ্চয়ই আমিই কোনো এক সময় টেলিফোন শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম। যেহেতু বড় উত্তেজনার মধ্যে আছি–কিছুই মনে থাকছে না।

আমি টেলিফোন ধবলাম।

একবারও খাটের দিকে তাকালাম না। দবকার কী? টেলিফোন আসায় ভালো হয়েছে–মন কিছুটা হলেও কেন্দ্রীভূত হবে।

হ্যালো!

কে, মিজান ভাই? আমি লীনা–রুবা আপার ঘুম ভেঙেছে?

উঁ।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কী বললেন বুঝতে পারি নি।

একবার ভেঙেছিল, আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

আপনি কি কাজের মেয়ে দুটির কথা তাকে বলেছেন?

হ্যাঁ।

আপা কী বলল?

কিছু বলে নি। কথা শুনেই আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিছুই বলে নি?

না।

আপনাদের মধ্যে ঝগড়া চলছে না তো? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, রুবা আপা ঘুমের ভান করে পড়ে আছে।

ভান-টান না। গভীর ঘুম।

হ্যালো মিজান ভাই! আমার ধারণা, আপনাদের মধ্যে সিরিয়াস ঝগড়া হয়েছে। বলুন তো ঠিক বলছি কি-না?

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলাম। অনেকক্ষণ ধরে যে বড় ধরনের বোকামি করছি তা ধরা পড়ল। কেন আমি বোকার মতো বলছি–রুবা ঘুমিয়ে আছে? আমার বলা উচিত, রুবা বাসায় নেই। পুলিশী ঝামেলা হতে পারে। পুলিশ আর কিছু পারুক না পারুক–দুনিয়ার মানুষকে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে। লীনাকে খুঁজে বের করে তারা বলবে–আপনার নাম লীনা?

লীনা ভয়ে আধমরা হয়ে বলবে–জি।

ঘটনার দিন রাতে আপনি টেলিফোন করেছিলেন। টেলিফোনে কী কী কথা হয়েছিল দয়া করে বলুন। কোনো পয়েন্ট বাদ দেবেন না। ভালো কথা, টেলিফোন কনভারসেসনের কোনো পর্যায়ে কি মিজান সাহেব বলেছেন যে, মিসেস রুবা বাসায় আছেন–ঘুমুচ্ছেন?

এ জাতীয় ঝামেলায় যাওয়াই যাবে না। কাজেই লীনাকে আমার বলে দেয়া উচিত যে, রুবা বাসায় নেই।

হ্যালো মিজান ভাই–আপনি চুপ করে আছেন, কিছু বলছেন না।

কী বলব?

রুবা আপার সঙ্গে কী আপনার ঝগড়া হয়েছে?

হুঁ।

উনি যথারীতি রাগ করে বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। তাই না?

হ্যাঁ।

দেখলেন, আমি কেমন চট করে ধরে ফেললাম? প্রথম যখন আপনাকে টেলিফোন করলাম তখন আপনার গলা শুনেই বুঝে ফেলেছি যে আপনি সত্যি কথা বলছেন না। এখন দয়া করে সত্যি কথাটা বলুন।

ও রাগ করে সন্ধ্যার একটু আগে বাসা ছেড়ে চলে গেছে। আমি খুব দুঃশ্চিন্তায় পড়েছি।

শুধু শুধু দুঃশ্চিন্তা করবেন না। রুবা আপার মার বাসায় খোঁজ করেছিলেন?

করেছিলাম, ওখানে নেই।

তার ছোট বোনের বাসায়?

ওখানে ফোন করি নি। আচ্ছা লীনা...তুমি কিছু মনে করো না, ইয়ে মানে, না থাক...

বলুন না কী বলবেন?

ওর কি কোনো...মানে ইয়ে...

না মানে, কোনো ছেলের সঙ্গে ইদানিং...

লীনা খুব হাসছে। মনে হলো দারুণ মজা পেয়েছে। হাসি থামিয়ে বলল, আচ্ছা! মিজান ভাই, বাড়ির বউদের আপনারা এমন হালকা ভাবেন কেন?

তুমি তোমার আপকে কিছু বলো না যেন। ও মনে কষ্ট পাবে।

কষ্ট তো অবশ্যই পাবে। আমি কিছু বলব না। শুনুন মিজান ভাই, আমি কিছু বলব না। আপনি বোধহয় উড়ো কথাবার্তা শুনেছেন— শুনেই আপনার আক্কেল গুড়ুম হয়েছে।

উড়ো কথা কিছু আছে না-কি?

মনসুর সাহেবকে নিয়ে অনেকোব মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস হয়। ঐসব কিছু না।

ও আচ্ছা, মনসুব সাহেবেব টেলিফোন নাম্বার তোমার কাছে আছে?

হ্যাঁ, আছে। আপনি কি সেখানে টেলিফোন করবেন? খবরদার। না।

তুমি টেলিফোন নাম্বারটা দাও না।

দিচ্ছি। আপনি কিন্তু ভুলেও বলতে পাববেন না–কোথেকে টেলিফোন নাম্বার পেয়েছেন।

আচ্ছা, বলব না।

লীনা টেলিফোন নাম্বার দিল। আমি টেলিফোন নাম্বার লিখে রাখলাম, যদিও টেলিফোন নাম্বার লিখে বা খাব কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই নাম্বার আমি জানি। টেলিফোন বই-এ লেখা আছে।

যা কবার আটঘাট বেঁধে করতে হবে। কোনো রকম ফাঁক-ফোকর রাখা যাবে না। থানায় টেলিফোন করে বলে রাখতে হবে যে, রুবা বাসা ছেড়ে চলে গেছে। ওসি সাহেব খুব অবাক হবেন না, কারণ এব। আগেও কয়েকবার তাকে রুবার নিখোঁজ হবার খবর দিয়েছি। সবই হচ্ছে বড় পরিকল্পনার অংশ। পরিকল্পনা নিখুঁত করার জন্যে যা যা করণীয়, আমি সবই করেছি। শ্বশুরবাড়িতেও একবার টেলিফোন করা দরকার। আমার শাশুড়িকে জানানো দবকার যে, রুবা বাসায় নেই এবং রুবার সঙ্গে তার কোনো কথা হয় নি।

অনেকবার টেলিফোন করেও আমি শ্বশুর বাড়ির লাইন পেলাম না। রিং করলেই এনগেজড টোন আসে। থানায় টেলিফোন করলাম, সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন ধরল।

রোবট ধরনের গলায় শোনা গেল–ওসি রমনা। স্লামালিকুম।

আমি বললাম, ওসি সাহেব, মিজান বলছি।

ও আচ্ছা, আচ্ছা। কী খরব? কী খ-ব-র?

ওসি সাহেবের খুব আন্তরিক গলা শোনা গেল। এই আন্তরিক গলা শোনার জন্যে আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমার উদ্ভাবনী ক্ষমতা ব্যবহার করতে হয়েছে। আমি এই

অবস্থা অনেক পরিকল্পনায় তৈরি করেছি। ওসি সাহেব হাসি হাসি গলায় বললেন, মিজান সাহেব, বলুন, খবর বলুন। ভাবি কি আবারো রাগ করে বাড়ি ছেড়ে গেছেন? হা হা হা।

ওসি সাহেবের এই বিমলানন্দের কারণ হচ্ছে, এর আগে তিনবার আমি থানায় টেলিফোন করে রুবার গৃহত্যাগের খবর দিয়েছি। একটা পরিস্থিতি তৈরি করার জন্যেই এই খবর দেয়া। যাতে পুলিশ যখন রুবার মৃত্যু নিয়ে ফাইন্যাল রিপোর্ট তৈরি করবে, তখন সেই রিপোর্টে উল্লেখ থাকবে–এই মহিলা প্রায়ই রাগারগি করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন।

প্রথমবার যখন রুবার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার খবর দিলাম, তখন ওসি সাহেব বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, আপনার স্ত্রী চলে গেছেন, চব্বিশ ঘণ্টাও তো হয় নি, চব্বিশ ঘণ্টা পার না হলে মিসিং পারসন হয় না। ধৈর্য ধরুন। আত্মীয়স্বজনের বাসায় খোঁজ করুন। আমি অত্যন্ত অনুগত গলায় বলেছি, জি আচ্ছা।

সকালের ভেতর খোঁজ না পেলে থানায় চলে আসবেন।

জি আচ্ছা।

আমি সকালবেলায় থানায় চলে গেলাম। ওসি সাহেবকে বললাম, আমার স্ত্রীকে পাওয়া গেছে। ও সকাল আটটার সময় বাসায় এসেছে।

ওসি সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন–দেখলেন তো, আমার কথা। ফলে গেল। এও অল্পতে অস্থির হওয়া ঠিক না।

আর অস্থির হবো না। আমি আপনার জন্যে সামান্য গিফট এনেছি। আপনি কি নেবেন?

ওসি সাহেব বিস্মিত হয়ে বলতেন, কী গিফট?

আমি খবরের কাগজে মোড়া এক কার্টুন বেনসন এন্ড হেজেস এগিয়ে দিতে দিতে বললাম, আপনাকে গভীর রাতে টেলিফোন করেছি, এই জন্যে...

ওসি সাহেব খুশি খুশি গলায় কপট বিরক্তি মিশিয়ে বললেন, পুলিশকে গভীর রাতে বিরক্ত করবেন না তো কাকে বিরক্ত করবেন? এই জাতীয় সমস্যা হলে টেলিফোন করবেন। যত রাতই হোক, করবেন। আমরা পুলিশরা আছি কী জন্যে?

দ্বিতীয় দফায় আমি আবার রুবার গৃহত্যাগের খবর দিলাম এবং যথারীতি পরদিন ভোরে খবর দিলাম যে, আমার স্ত্রী ফিরে এসেছে। এবারো এক কার্টুন সিগারেট নিয়ে গেলাম।

ওসি সাহেবের সঙ্গে খাতির হয়ে গেল। ওসি সাহেব ধরে নিলেন, আমি নির্বোধ ধরনের ভালো মানুষ গোছের একজন মানুষ, যাকে তার স্ত্রী তেমন পছন্দ করে না বলে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

এ পর্যন্ত চার কার্টুন বেনসন এন্ড হেজেস সিগারেট আমি ওসি সাহেবকে দিয়েছি। এই চার কার্টুন সিগারেটের দাম দুই হাজার পাঁচশ টাকা। এই দুই হাজার পাঁচশ টাকায় আমি এখন যে উপকারটা পাব তার দাম দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

স্ত্রী খুন হলে প্রথম সন্দেহ এসে পড়ে স্বামীর ওপর। থানার ওসি গোড়াতেই ধরে নেন– স্বামী এই খুনটি করেছে। আমার বেলায় এটা হবে না। ওসি রমনা থানা আমাকে খুনী ভেবে নিয়ে তদন্ত শুরু করবেন না। তিনি ধরেই নেবেন আমি সাতেও নেই পাচেও নেই। একজন মানুষ। আমাকে ঝামেলা থেকে রক্ষা করা তখন তার প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

মিজান সাহেব।

জি।

চুপ করে আছেন কেন, কথা বলুন, ভাবি কি আবার গৃহত্যাগী?

জি।

আপনি চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়েছেন–রাত তো মাত্র এগারোটা পঁচিশ। সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন এবং বেনসন এন্ড হেজেসের কার্টুন নিয়ে আমার এখানে চলে আসুন। ভাবির গৃহত্যাগ মানে তো আমার লাভ–হা-হা-হা।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো শব্দ করলাম। ওসি সাহেব বললেন, কী হলো?

আমি বললাম, কিছু না। মনটা খুব খারাপ।

আমার একটা উপদেশ শুনুন ভাই সাহেব, স্ত্রীকে কম ভালোবাসবেন। স্ত্রীকে যত কম ভালোবাসবেন ততই কম যন্ত্রণা পোহাতে হবে। ভালোবেসেছেন কি মরেছেন। সম্রাট শাহজাহানের দিকে তাকিয়ে দেখুন, স্ত্রীকে ভালোবেসে কী বিপদে পড়েছে! সব টাকা পয়সা

খরচ করে তাজমহল বানাতে হলো–হা-হা-হা। আপনার যা নেচার আমার তো মনে হয় আপনিও তাজমহল-টহল কিছু বানাবেন। মিজান সাহেব!

জি।

আজ। আপনাকে অন্যদিনের চেয়েও মনমরা মনে হচ্ছে। ব্যাপার কী বলুন তো? ঝগড়া কি চূড়ান্ত রকমের হয়েছে না-কি?

জি-না। আজ ওর কাছে লেখা একটা চিঠি হঠাৎ ড্রয়ারে পেয়ে মনটা খারাপ হয়েছে।

চিঠি? কার চিঠি?

বাদ দিন।

না, না। বাদ দেব কেন? আপনি আমার বন্ধু মানুষ। আপনার একটা সমস্যা হলে আমি দেখব না? কী পেয়েছেন বলুন। প্রেমপত্র?

হুঁ।

কে লিখেছে?

বাদ দিন।

নামটা বলুন। খোঁজ নেব। স্ট্রেইট লাইন বানিয়ে ছেড়ে দেব।

ওর নাম মনসুর। আমার ধারণা, রুবা এখন ওর বাসাতেই আছে। চক্ষুলজ্জায় পড়ে খোঁজ নিতে পারছি না।

আপনাকে কোনো খোঁজ নিতে হবে না। আপনি ডেলিকেট অবস্থায় পড়েছেন সেটা বুঝতে পারছি। খোঁজ-খবর আমিই করব। টেলিফোন নাম্বার আছে ঐ লোকের? থাকলে দিন। এক্ষুণি পাত্তা লাগাচ্ছি। তারপরেই আমি আপনাকে জানাব। মন খারাপ করবেন। না ভাই। বি হ্যাপি। লাইফে এরকম হয়।

আমি মনসুরের টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম। এখন বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছি। মনটা হালকা লাগছে। আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। আমি এখন যা করব তা হলো...

পানির পিপাসা হচ্ছে। তীব্র পানির পিপাসা। পোলাও খাবার জন্যে এটা হচ্ছে। পানির পিপাসার একটা ব্যাপার হচ্ছে এটা আস্তে আস্তে হয় না। হঠাৎ পিপাসা শুরু হয়। আমি ফ্রিজ খুলে পরপর দু গ্লাস পানি খেলাম। বাথরুম সেরে রাখার জন্যে বাথরুমে ঢুকলাম। দুগ্লাস পানি খেয়েছি, বাথরুম তো পাবেই। বাথরুমের দরজা বন্ধ করা মাত্রই হঠাৎ মনে হলো— এখন যদি দরজা আর খুলতে না পারি তাহলে কী হবে? এরকম একটা গল্প কোথায় যেন পড়েছিলাম— বন্ধু একা থাকে, তাকে সে খুন করল। খুনের পর পর তার খুব পিপাসা পেয়ে গেল। সে পুরো এক জগ পানি খেয়ে ফেলল। পানি খাওয়ার পর পর ঢুকাল বাথরুমে। দরজা বন্ধ করে বাথরুম সারল, তারপর আর বাথরুমের দরজা খুলতে পারে না। ছিটকিনি শক্ত হয়ে এঁটে গেছে। প্রাণপণ শক্তি দিয়েও সে কিছুই করতে পারছে না। পরদিন পুলিশ এসে দরজা খুলে তাকে বের করল। অতিপ্রাকৃত কোনো ব্যাপার এর মধ্যে ছিল না, পুরো ব্যাপারটাই ছিল সাধারণ একটা ব্যাপার। খুনীর শরীর দুর্বল হয়ে

গিয়েছিল। মাংসপেশি হয়েছিল শিথিল। শিথিল মাংসপেশি নিয়ে সে ছিটিকিনি খুলতে পারছিল না। যতই সময় যাচ্ছিল ততই তার শরীর আরো দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এর বেশি কিছু না।

আরেকটা গল্প শুনেছিলাম।–এক লোক গরু বিক্রি করে ফিরছে। পথে এশার নামাজের সময় হলো। সে নামাজ পড়তে ঢুকল এক গ্রামের মসজিদে। তাকে অনুসরণ করছিল এক চোর। সেও সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে ঢুকল। মুসল্লীরা নামাজ শেষ করে চলে গেছেন। সে একা একাই নামায়ে দাঁড়াল। তখন চোরটা তাকে জাপ্টে ধরল। টাকা নেবার জন্যে। দুজনে ধস্তাধস্তি হচ্ছে–চোরটা এক পর্যায়ে ছুরি বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। চোরটা গরু বিক্রির টাকাটা নিয়ে নিল। তারপরেই হলো সমস্যা। চোর সারা ছোটাছুটি করছে। দরজা খুঁজে পাচ্ছে না। ব্যাকুল হয়ে সে ঘুরছে আর চেঁচাচ্ছে–দরজা কই? দরজা কই?

পুরো সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার। এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছু নেই। ভূমিকম্পের সময়ও এরকম হয়। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ ঘরের ভেতর ছোটাছুটি করে দরজা খুঁজে পায় না। আগুন লাগলেও এমন হয়। আমার মেজো মামার বাড়িতে একবার আগুন লাগল। ঘুম ভেঙেই তিনি দেখেন–দাউ দাউ করছে আগুন। তিনি ছোটাছুটি করতে লাগলেন এবং চেঁচাতে লাগলেন, দরজা পাইতেছি না! দরজা!

৩. আমি বাথরুম সারলাম

আমি বাথরুম সারলাম। চোখে-মুখে খানিকটা পানি দিলাম। ছিটিকিনি খুলতে আমার বেগ পেতে হলো না। বাথরুমের বাইরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আর তখন শোবার ঘরে ধাপ করে শব্দ হলো।

এর মানে কী?

কানে ভুল শুনছি। ধাপ করে শব্দ হবার কী আছে? চেয়ার টানার শব্দ হচ্ছে। কে যেন চেয়ার টানছে। মেঝের উপর চেয়ার টানার ক্যাচ ক্যাচ শব্দ। কে চেয়ার টানবে?

আমি শোবার ঘরে শুয়ে পড়লাম। কোনো দুর্বলতাকে প্রশয় দেয়া যাবে না। ভয় পাওয়া যাবে না। কিছুতেই না। ভয় এমন বস্তু যে, একবার ভয় পেলেই তা ফুলে-ফোঁপে বাড়তে থাকে।

আমি শোবার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন বেজে উঠল। আমি রিসিভার কানে তুলে বললাম, হ্যালো।

ওসি রমনা থানা বলছি।

স্লামালিকুম ভাই।

ওয়ালাইকুম সালাম–মিজান সাহেব, আমি ঐ মনসুরকে টেলিফোন করেছিলাম। আপনার স্ত্রী ওখানে নেই। কনফার্ম। পুলিশের টেলিফোন পেয়ে সে ভ্যাবাচক খেয়ে গেছে। সে বলেছে আপনার স্ত্রী তার কাছে যান নি, তবে তিনি টেলিফোন করেছিলেন।

কী বললেন? টেলিফোন করেছিল?

জি। রাত নটার দিকে টেলিফোন করেছিল। আপনার নাকি তাকে নিয়ে কোনো বিয়েতে যাবার কথা। আপনি তাকে ফেলে চলে গেছেন, এই নিয়ে দুঃখ করছিলেন।

ও।

কাজেই আপনি কোনো রকম দুঃশ্চিন্তা করবেন না। আর শুনুন ভাই, আমি ঐ মনসুর ব্যাটাকে আন্ডার অবজারভেশন রাখব। লাইফ হেল করে দিব। কোনো চিন্তা করবেন না।...

তার কথা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই আমি খাটের দিকে তোকালাম। আমি এটা কী দেখছি? রুবা শুয়ে নেই। সে বসে আছে। কুকুর। যেমন থাবা গেড়ে বসে সেও ঠিক সে-রকম থাবা গেড়ে বসে আছে। তবে তাকিয়ে আছে খোলা দরজার দিকে। আমার দিকে না। ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক যে কিছুক্ষণ আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হলো না। আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম। এক সময় দৃশ্যের অস্বাভাবিকতা আমোব মাথায় ঢুকাল। ঝন ঝন একটা শব্দ হলো–দেখি টেলিফোন রিসিভার আমার হাত থেকে পড়ে গেছে।

টেলিফোন রিসিভার থেকে শব্দ আসছে–হ্যালো। হ্যালো। হ্যালো। ক্ষীণ আওয়াজ যেন অনেক দূর থেকে কেউ ডাকছে। আমি টেলিফোনের কানেকশন খুলে ফেললাম। টেলিফোন

কানেকশন খুলতে যতটা সময় লাগানো উচিত তারচেয়েও বেশি সময় লাগালাম। যেন টেলিফোন কানেকশন খোলা এই মুহুর্তে সবচে জরুরি কাজ। এটাই একমাত্র সত্য আর সব মিথ্যা।

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকলে কেমন হয়? চোখ রেস্ট পাক। রেক্ট পেলে সব স্বাভাবিক হবে। তখন দেখা যাবে কেউ কুকুরের মতো থাবা গেড়ে দরজার দিকে তাকিয়ে বসে নেই। সবই ভ্রান্তি। কিন্তু চোখ বন্ধ করার মতো সাহসও পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, একবার যদি চোখ বন্ধ করি তাহলে আর চোখ খুলতে পারব না। কিংবা খুললেও সেই চোখে কিছুই দেখব না। এসব হচ্ছে দুর্বল মনের কল্পনা। দুর্বল মনের কোনো কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না। এখন মন শক্ত করতে হবে। অনেক কাজ বাকি আছে। আসল কাজই বাকি। এতক্ষণ যা করেছি। সব নকল কাজ।

ডেডবডি সরাতে হবে। দ্রুত সরাতে হবে। এমনভাবে সরাতে হবে যেন কেউ এর কোনো খোঁজ না পায়। ডেডবডি পাওয়া না গেলে খুনের মামলা দাঁড় হয় না। খুন হয়েছে কি-না তা জানার প্রথম শর্ত হলো ডেডবডি। সুরতহাল হবে। ডাক্তাররা বলবেন, খুন। তবেই না মামলা চালু হবে।

ডেডবডি সামলানোর প্রচলিত যে কটি পদ্ধতি আছে তার সব কটিতে গণ্ডগোল আছে। একটাও ফুল প্রাফি নয়। লোকজন কী করে বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দেয়? দুদিন না যেতেই বস্তা ভেসে উঠে। উৎসাহী লোকজন ছুটে আসে। বস্তা খোলা হয়। পত্রিকায় রিপোর্টের পর রিপোর্ট বের হতে থাকে। আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে, মাটি খুঁড়ে মাটি চাপা দেয়া। পদ্ধতিটা খারাপ না, তবে এর জন্যে গর্ত গভীর হতে হবে। মাটি চাপা। দেবার

এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে, যা অসম্ভব কঠিন কাজ।

আমার পদ্ধতি ভিন্ন। সহজভাবে পদ্ধতিটা হলো–ডিসপারসান পদ্ধতি। টুকরো টুকরো করে বড় একটা অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়া। যত ক্ষুদ্র টুকরা হবে এবং যত বেশি ছড়ানো যাবে তত দ্রুত হত্যার প্রধান আলামত মৃতদেহ উবে যাবে। কোনো টুকবা কুকুরে খাবে, কোনোটা খাবে কাক। আমি ঠিক করেছি–ডেডবডি বাথরুমে নিয়ে... ..ছোট ছোট পিস করা হবে... ..থাক, এখন এসব চিন্তা করে লাভ নেই। আপাতত কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকি। তারপর চোখ খুলিব এবং দেখব রুবা বসে নেই। আগে যেভাবে বিছানায় ছিল এখন সেভাবে বিছানাতেই আছে।

আমি চোখ বন্ধ করলাম এবং মনে মনে বলতে থাকলাম–ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান, ওয়ান থাউজেন্ড টু, ওয়ান থাউজেন্ড থ্রি...। কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে আছি সেই আন্দাজ পাওয়ার জন্যই বলা। ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান বলতে এক সেকেন্ড সময় লাগে।

ওয়ান থাউজেন্ড থাটি পর্যন্ত আমি চোখ বন্ধ করে আছি। অর্থাৎ প্রায় ৩০ সেকেন্ড চোখ বন্ধ। অনেকখানি সময়। চোখ খুললাম।

রুবা বসে আছে। তবে এখন সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে পলকহীন চোখে। ঈষৎ হং করে আছে। জিভ দেখা যাচ্ছে। জিহবার রঙ এখনো গাঢ় কালো।

যে বসে আছে সে রুবা নয়। She is dead... Dead and gone... অন্য কেউ। আমি টেলিফোনের কাছে রাখা চেয়ারে বসে পড়লাম, আর তখনই রুবা স্পষ্ট করে বলল, পানি খাব।

সে কি সত্যি কথা বলছে, না। আমি ভুল শুনছি? অডিটরী হেলুসিনেশন। আমার মাথা বোধহয় জট পাকিয়ে গেছে। সে আবারো বলল, পানি খাব।

আমি লক্ষ করলাম, কথাগুলি বলার সময় তার ঠোঁট নড়ল না, জিহবা, নড়ল না। গলার স্বর রুবার মতোই, তবে অস্পষ্ট, জড়ানো।

আমি বললাম, পানি খাবে?

হুঁ, তিয়াশ হয়েছে।

রুবাই কথা বলছে। তিয়াশ শব্দটা রুবার শব্দ। এটা রুবা বলে। আমি কী করব? পানি এনে দেব? আমার পক্ষে এমন হাস্যকর কিছু করা কি সম্ভব? আমি পানি এনে দিচ্ছি একটা মৃতদেহকে। আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, রুবা!

হ্‌।

তুমি বেঁচে নেই। তুমি মারা গেছ। You are dead. Dead like a stone.

পানি খাব।

তুমি আমার কথা বুঝতে পারছি? আমি তোমাকে মেরে ফেলেছি।

ও।

তুমি শুয়েছিলে। আমি একটা বালিশ এনে তোমার মুখের ওপর চেপে ধরেছি।

ও।

তুমি যে মাবা গেছ তা কি বুঝতে পারছি?

পানি।

পানি আমি তোমাকে এনে দেব। তুমি ভেব না। আমি তোমাকে দেখে আতঙ্কে অস্থির হয়েছি। আমার ভয় খুব কম। অন্য যে কেউ এই অবস্থায় এটফেল করে মরে যেত। আমি মবি নি এবং আমি কথা বলছি তোমার সঙ্গে। আমি কি বলছি বুঝতে পারছি? বুঝতে পারলে মাথা নাড়াও।

রুবা মাথা নাড়ল না। যেভাবে বসেছিল। সেভাবেই বসে রইল।

আমি খাবার ঘরে ঢুকলাম। প্রথমে বের করলাম ব্রান্ডিব বোতল। পুরো কাপ। ভর্তি করে ব্রান্ডি ঢালিলাম। ব্রান্ডির জন্য আলাদা গ্রাস আছে। গ্লাস বের করতে ইচ্ছা করছে না। অতি দ্রুত স্নায়ুর উপর দিয়ে ঝড় বইয়ে দিতে হবে। তখন শরীর ঠিক হবে। সব ফিরে যাবে আগের জায়গায়। ব্যাক টু দি প্যাভিলিসন।

কাপের ওপর পিপড়া ভাসছে। ভাসুক। পিপড়া খাওয়া ভালো। পিপড়া খেলে সাঁতার শেখা যায়। আচ্ছা, আমি কি সাঁতার জানি? সাঁতার জানি কি জানি না। অনেক ভেবেও মনে করতে পারলাম না। তার মানে আমার মস্তিষ্ক কাজ করছে না। মুখ ভর্তি ব্রান্ডি নিয়ে গিলে ফেললাম। জিহবা, নাড়ি-চুড়ি জ্বলতে লাগল। জ্বলুক। জ্বলে ছাই হয়ে যাক।

এই, এই!

রুবা ডাকছে। পানি খেতে চায়। তাকে পানি খেতে দেব, না এক কাপ ব্রান্ডি দেব?

কেউ পানি চাইলে নিষেধ করতে নেই। কেউ পানি চাইলে তাকে পানি দিতে হয়, পানি না দিলে রোজ হাশরের ময়দানে যখন তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যাবে তখন পানি পাওয়া যাবে না। এই কথা বলতেন। আমার মা। কোনো ভিখিরি পানি চাইলে আমার মা অতি ব্যস্ত হয়ে বলতেন–মিজান, ও মিজান! বাপধন, পানি দিয়ে আয়। টিনের মধ্যে টেস্ট বিস্কুট আছে। বিস্কুট দিয়ে পানি দে।

ভিখিরিদের পানি খাওয়ানোর জন্যে আমাদের একটা বড় এলুমিনিয়ামের গ্লাস ছিল। মাসের প্রথমেই বড় একটা টিন ভর্তি টেস্ট বিসকিট কিনে রাখা হতো। অন্য বিসকিটগুলো নরম হয়ে যায়। টেষ্ট বিসকিট কখনো নরম হয় না, যতই দিন যায় ততই শক্ত হতে থাকে–শক্ত হতে হতে এক সময় লোহার মতো শক্ত হয়ে যায়।

একবার এক ভিখিরি ভিক্ষা চাইতে এসেছে–আমি যথারীতি তাকে এক গ্রাস পানি এবং একটা টোস্ট বিসকিট দিলাম। সেই বুড়ো ভিখিরি বিসকিট দেখে আনন্দে অভিভূত হলো।

আমি দেখলাম, সে পানিতে বিসকিট ভিজিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছে। লোকে চায়ে বিসকিট ভিজিয়ে খায়, সে খাচ্ছে পানিতে ভিজিয়ে। কিন্তু বিসকিট নরম হচ্ছে না।

আমার মা দিনের পর দিন ভিখিরিদের পানি খাইয়ে গেলেন। নিজে মৃত্যুর সময় পানি খেতে পারলেন না। তার জলাতঙ্ক হয়েছিল। কুকুর তাঁকে কামড়ায় নি–শুধু আদর করে আঁচড়ে দিয়েছিল।

এই কুকুর ছিল মায়ের পোষা। দুপুরের দিকে বাসায় এসে দরজা ধাক্কাতো। মা একটা টিনের থালায় ভাত-মাছ দিয়ে বলতেন–ধর খা।

সে ভাত-মাছ খেয়ে আরাম করে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে বিদেয় হতো। অসুস্থ হবার পর কুকুরটা এলো চোখ লাল করে। কী ভয়ঙ্কর চেহারা! মা বললেন, এই, তোর কী হয়েছে রে? তুই এই রকম করছিস কেন?

কুকুর ঘড়ঘড় আওয়াজ করল। সেই আওয়াজও ভয়াবহ। মা কিছুই বুঝতে পারলেন না। নিজেই টিনের থালায় ভাত বেড়ে দিলেন। কুকুর খাবারে মুখ দিল না। বাপ দিয়ে মার কোলে উঠে তাঁকে আঁচড়ে দিল। মা বিরক্ত গলায় বললেন–করে কী, করে কী? তিনি ছিঃ ছিঃ করে উঠে গেলেন। অবেলায় গোসল করলেন। সন্ধ্যার দিকে তাঁর অল্প জ্বর হলো। পরদিন দিব্যি ভালো। তখনো তিনি জানেন না। তাঁর শরীরে ভয়ঙ্কর বিষ ঢুকে গেছে। যখন জানা গেল তখন করার কিছুই ছিল না।

মৃত্যুর সময় তাঁকে স্টোর রুমে তালাবন্ধ করে রাখা হলো স্টোর রুমের একটা জানালা। সেই জানালায় শিক বসানো। মা দুহাতে শিক চেপে ধরে শ্লেষ্মা জড়ানো ভারি গলায়

চিৎকার করতেন, পানি! পানি! রুবা পানি পানি বলছে। তার গলার স্বরটা কি ভারি শোনাচ্ছে না? শ্লেষ্মা জড়ানো মনে হচ্ছে না? না-কি আবারও শোনার ভুল? মার কথাই বা এখন মনে পড়ল কেন? আমি মার কথা মনে করতেই চাই না। মনে করিও না। এটা কি ব্রান্ডি খাওয়ার জন্যে হয়েছে? মাথা ঝিমঝিম করছে, শরীর হালকা। এতটা ব্রান্ডি এক সঙ্গে খাওয়া ঠিক হয় নি। ভুল হয়েছে। একটা ভুল যদি কেউ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে আরো তিনটা ভুল করে। ভুল একা চলে না, সে চলে সঙ্গী-সাথি নিয়ে। আমি এখন পরপর কয়েকটা ভুল করব। সেই ভুলগুলি কী কী?

শোবার ঘর থেকে আবার শব্দ হলো–পানি, পানি।

আমি গ্লাস ভর্তি করে পানি নিলাম। রুবার নিজের গ্রাসেই নিলাম। সে অন্যের গ্লাসের পানি খেতে পারে না। এখন সে বেঁচে নেই। সে সে... কী বলতে চাচ্ছি। বুঝতে পারছি না। মৃত মানুষের জন্যে পানি নিয়ে যাচ্ছি, এটা কি দ্বিতীয় ভুল না? আচ্ছা, আমি একজন মৃত মানুষের জন্যে পানি নিয়ে যাচ্ছি কেন?

পানির গ্লাস রুবার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে হাত বাড়িয়েছে কিন্তু গ্লাস ধরতে পারছে না। তার আঙ্গুল কাঁপছে। আমি বিছানার পাশে সাইড টেবিলে গ্লাস নামিয়ে রাখলাম। সে পারলে টেবিল থেকে গ্রাস নেবে। না পারলে নেবে না। আমার পানি দেবার কথা, আমি দিয়েছি। বাকিটা তার ব্যাপার।

রুবা এগুচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে। তাকে দেখাচ্ছে কুকুরের মতো। জলাতঙ্ক রোগি শেষের দিকে কুকুরের মতো হয়ে যায়। কুকুরের মতো ঘড়ঘড় শব্দ করে, মুখ দিয়ে লালা

ঝরতে থাকে এবং জিহবা বের করে দেয়। এটা আমার কথা না; ইদ্রিস বলে আমাদের যে কাজের ছেলে ছিল তার কথা।

মার যখন জলাতঙ্ক ধরা পড়ল তখন সে চুপি চুপি আমাকে বলল। আমার তখন সাত বৎসর বয়স। ইদ্রিস আমার শিক্ষাগুরু। কত কিছু আমাকে সে শেখায়। তার প্রতিটি শব্দ আমি বিশ্বাস করি।

বুঝছেন ছোট মিয়া, কুত্তায্য কামড়াইলে পেডে কুত্তার বাচ্চা হয়। মেয়েছেলের পেডেও হয়। পুরুষ ছেলের পেডেও হয়। আব্ব মানুষটা আস্তে আস্তে কুত্তার লাহান হয়। তার শইল্যে লোম উইঠা যায়–ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। এক আচানক দৃশ্য ছোট মিয়া.।

তুমি দেখেছ?

কত দেখলাম। অখন তুমিও দেখবা।

স্টোর রুমের আশেপাশে আমাদের যাওয়া নিষেধ ছিল। তারপরেও মাঝে মাঝে উঁকি দিতাম মা কতটা কুকুর হয়েছেন দেখার জন্যে। মা আমাকে চিনতে পারতেন না। কাউকেই পারতেন না। শুধু আমার বড়বোনকে চিনতেন। বড়বোনকে দেখলেই বলতেন–মিনা, বাতাস বাতাস।

কেন বলতেন। আমরা জনতাম না। বোধহয় তার গরম লাগত। স্টোর ঘরটা ছিল ছোট। একটাই জানালা। মা শেষদিকে টেনে টেনে তাঁর গায়ের সব কাপড় ছিঁড়ে ফেললেন। পুরো নগ্ন হয়ে মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলেন। যা পেতেন, কামড়ে ধরতেন। একদিন

দেখি, পুরনো জুতা চিবুচ্ছেন। ইদ্রিস বলল, ছোটমিয়া দেখছেনক্যামনে কুত্তা হইতাছে? খিক্ খিকখিক।

ব্যাপারটা তার কাছে খুব মজার মনে হচ্ছিল। সে বলতে গেলে সারাক্ষণই স্টোররুমের আশেপাশে ঘুরঘুর করত। বাবা একদিন তাকে মারলেন। ভয়ঙ্কর মার। ইদ্রিসের ঠোঁট কেটে গেল। দাঁত ভেঙে গেল। রক্তে তার গেঞ্জি মাখামাখি। সে নাকি স্টোর রুমের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে খিকখিক করে হাসছিল। বাবা হুঁঙ্কার দিলেন। হারামজাদা, তোকে আমি খুন করে ফেলব। হুঁঙ্কার এবং চড় থাপ্পড়, কিল ঘুসি। বাবারও বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মার মৃত্যুর কাছাকাছি সময় তিনি যা করে সবই পাগলের কাজ। সুস্থ মানুষের কাজ না। সুস্থ মানুষ এইসব করে না। যেমনমঙ্গলবার শেষরাতে বাবা বিছানা থেকে আমাদের টেনে নামালেন। চাপা হুঁঙ্কার–অজু বুদ্ধ কর। আমরা চার ভাইবোন অজু করলাম। আর আমার সাথে—তোর মাকে দেখবি।

আমরা স্টোর রুমের সামনে এসে দাঁড়ালাম। স্টোর রুম অন্ধকার। বাবা মার ওপর টর্চের আলো ফেললেন। কী কুৎসিত দৃশ্য! যেন একটা পশু চার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে–ধো ঘো শব্দ হচ্ছে। বাবা বললেন, দেখলি?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, হুঁ।

এখন আয় আমার সাথে।

আমরা বাবার শোবার ঘরে ঢুকলাম। সেখানে বিছানায় পাটি পাতা। বাবা বললেন, পাটিতে বসে আল্লাহর কাছে হাত তুলে বল, হে আল্লাহপাক, আমার মার সব কষ্টের অবসান কর।

আমার মার মৃত্যু দাও। স্বামীর কথা আল্লাহ শুনবে না। স্বামীরা প্রায়ই স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করে। ছেলেমেয়ের কথা শুনবে। তোয়া করে।

আমরা দোয়া করলাম।

বাবা পাথরের মতো মুখ করে পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, দোয়া শেষ করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, আমাদের কাজের মেয়ে রহিমাবু এসে বললআম্মাজান নড়াচড়া করতেছে না, মনে হয়। উনার মৃত্যু হইছে।

আমা তোয়া করেছি বলে মার মৃত্যু হয়েছে এটা আমি মনে করি না। আমি আমার অন্য ভাই বানদের কথা জানি না। কিন্তু আমি নিজে মার মৃত্যুর কথা আল্লাহকে বলি নি। আমি হাত তুলে চুপচাপ বসেছিলাম। ভাইবোনদের তোয়ার কারণে মার মৃত্যু হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আমার ধারণা, দোয়া না করলেও মঙ্গলবার ভোরবেলা তাঁর মৃত্যু হতো।

মার মৃত্যুর পর বাবা চাকরি ছেড়ে দিলেন। বেশির ভাগ সময়ই তিনি স্টোর রুমের দরজা বন্ধ করে বসে থাকতেন। খাওয়া-দাওয়ার খুব অনিয়ম করতেন। হয়তো টেবিলে খাওয়া দেয়া হয়েছে, তাকে খেতে ডাকা হলো, তিনি বললেন, না।

আমার মনে হয় তার মাথার গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল। একদিন হঠাৎ বললেন, তিনি আর পানি খাবেন না।–আমার স্ত্রী পানির জন্যে ছটফট করেছে, পানি পায় নাই। জাঁভিৎ3 নেি শান্ত না।

তামে পানি অবশ্যি খাওয়ানো হয়। আমার ছোটখালা কাঁদতে কাঁদতে যখন বলেন, পানি খান দুলাভাই। আপনি মারা গেলে বাচ্চাদের কে দেখবে? বাবা পানি খান। তাঁর মাথা কিন্তু সারে না। কথাবার্তা বন্ধ করে দেন।

তাঁর একটাই কথা–একটা মানুষ যে কোনোদিন কোনো অন্যায় করে নাই, কোনো পাপ করে নাই, মানুষের দুঃখ দেখলে যে অস্থির হয়ে যেত— তার কেন এই কষ্ট?

বাব তখন খুব অসুস্থ, আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে আছি, তখন তিনি একদিন বললেন– তোরা শুনে রাখা। কেউ পানি চাইলে তোর মা অস্থির হয়ে পড়ত—কোনো ফকির-মিসকিন বলতে পারবে না। সে পানি চেয়েছে, তোদের মা শুধু পানি তাকে দিয়েছে। পানি দিয়েছে, পানির সঙ্গে কিছু খেতে দিয়েছে। সে মরাল কীভাবে? পানির তৃষ্ণায়।

কোনো মেয়ে ছেঁড়া শাড়ি পরে এসেছে। এমন শাড়ি যে শরীর ঢাকতে পারছে না।–তোদের মা তৎক্ষণাৎ তাকে শাড়ি দিয়েছে। কত রাগোরাগিও এই নিয়ে তোদের মার সঙ্গে করেছি। সে কী বলত? বলত, আহা, শরীর ঢাকতে পারছে না–লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে– কী লাজ! সে মরাল কীভাবে লজ্জার মধ্যে। সে যখন মরল নগ্ন অবস্থায় মরল। হেন লোক নেই যে তাকে নগ্ন দেখে নি।

পশু-পাখির জন্যে তার মমতার শেষ ছিল না। একটা কাক এসে রেলিং-এ বসলে সে কী করত? ভাত ছিটিয়ে দিত। বলত, আহা বেচারা, খিদে পেটে এসেছে। কুকুরবেড়াল যেটাই এসেছে, টিনের থালায়.খাবার দিয়েছে। সে মরাল কীভাবে? কুকুরের হাতে।... ..কেন? বল কেন? চুপ করে থাকবি না। বল।

৪. চুক চুক শব্দ হচ্ছে

চুক চুক শব্দ হচ্ছে।

তাকিয়ে দেখি, হামাগুড়ি দিয়ে রুবা চেয়ারের কাছে পৌঁছে গেছে। গ্রাসের পানি খাচ্ছে। মানুষের মতো না, কুকুরে মতো। জিব পানিতে ডুবিয়ে টেনে টেনে নিচ্ছে। কুচকুচে কালো একটা জিব। অনেকখানি লম্বা। হচ্ছেটা কী? তার গায়ে কাপড়ও নেই। সে কাপড় খুলল কখন?

আমি তাকিয়েই আছি। রুবা পানি খেতে খেতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, গরম! হুঁহো!

আমি ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলাম বারান্দায়। আমারও গরম লাগছে। বারান্দায় খানিকক্ষণ বসাযাক। Something is wrong, Something is very wrong.

ঘরের ভেতরের তুলনায় বাইরে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। উত্তরের বারান্দা, ঠাণ্ডা হবেই। হিমালয় থেকে ঠাণ্ডা বাতাস মনে হয় ছাড়তে শুরু করেছে। বারান্দায় দুটা প্লাষ্টিকের ফোল্ডিং চেয়ার। রুবা গুলশান এক নম্বর মার্কেট থেকে কিনে এনেছিল। হলুদ ফ্রেমের ভেতব সবুজ প্লাস্টিকের ফিতার বুনোনের চেয়ার। সুন্দর। চেয়ার দুটা কেনার পর সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মানানসই টেবিলের জন্য। কোনো টেবিলই তার পছন্দ হয় না। সুন্দর চেয়ার দুটির সঙ্গে নাকি কোনো টেবিলই মিশ খায় না। শেষটায় সে খবর দিয়ে আনল। তার এক মামাতো ভাই মাজহারকে। আর্ট কলেজের ছাত্র। সে নাকি ডিজাইন করবে। এই ডিজাইন মতো টেবিল হবে। মাজহারের কোনো ডিজাইনই রুবার পছন্দ হয় না। যেটা পছন্দ হলো সেই

টেবিলই এই মুহূর্তে আমার সামনে। বদখত একটা জিনিস। আমি অবশ্যি রুবাকে বলেছি– ভালো। তেমন উচ্ছ্বাস দেখাই নি। উচ্ছ্বাস আমি কখনো দেখাই না।

বারান্দাটা রুবা আমাদের দুজনের জন্যে সাজিয়েছে। বারান্দায় আমরা বসব। চা খাব। অন্য কেউ এখানে আসতে পারবে না। এ বাড়ির এই অংশটিতে কারোরই প্রবেশাধিকার থাকবে না। এখানে আসতেও হবে খালি পায়ে।

এখন অবশ্যি আমি খালি পায়েই আছি। পায়ে ঠাণ্ডা লাগছে। টেবিলের উপর পা তুলে দিলাম। এখন মজা হয়। রুবা যদি ট্রেতে করে দুইকাপ চা নিয়ে এসে উপস্থিত হয় এবং বলে–নাও, চা নাও। কীভাবে বসেছ? পা নামিয়ে ভদ্র হয়ে বোস।

এখানে যে কাণ্ডকারখানা ঘটছে তা কি কাউকে বলা যায়? বললে কি কেউ বিশ্বাস করবে? আমি যদি আমাদের অফিসের নুরুজ্জামান সাহেবকে ঘটনাটা বলি তিনি কী ভাববেন? বা আমি যদি এখনই উনাকে টেলিফোন করে বলি যে কিছুক্ষণ আগে আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি, তাহলে উনি কী মনে করবেন? তার মুখের ভাব কীভাবে বদলাবে? চিন্তা করেই হাসি পাচ্ছে। খানিকক্ষণ হাসলাম। নিজের মনেই হাসলাম। মনে মনে নুরুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছি। উনার মুখের ভাব বদলাচ্ছেকল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, আর আমার হাসি পাচ্ছে। ব্রান্ডির প্রভাব। ব্রান্ডিটা বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। এতটা খাওয়া ঠিক হয় নি।

হ্যালো নুরুজ্জামান সাহেব?

জি। জি। (নুরুজ্জামান সাহেব বেশিরভাগ কথাই দুবার করে বলেন।)

আমাকে চিনতে পারছেন?

কেন চিনিব না? কেন চিনিব না? আপনি জামান। জামান। ব্যাপার কী, এত রাতে! খবর ভালো?

জি, খবর ভালো। তবে কিছুক্ষণ আগে খুন করেছি।

কী করেছেন?

খুন! মার্ডার।

নুরুজ্জামান সাহেব ফোঁস ফোঁস জাতীয় শব্দ করছেন।

বুঝলেন নুরুজ্জামান সাহেব, ও ঘুমাচ্ছিল। মুখের উপর বালিশ চেপে ধরেছি। দশ মিনিটেই রেজাল্ট আউট।

হুঁ।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে, মরার পরে সে আবার বেঁচে উঠেছে। ঘুর ঘুর করছে। পানি খাচ্ছে।

ও পানি খাচ্ছে। পানি খাচ্ছে।

মানুষের মতো খাচ্ছে না। কুকুরের মতো খাচ্ছে। জিব পানিতে ভিজিয়ে চোটে চেটে নিচ্ছে। আসুন না, দেখে যাবেন।

জি না। জি না।

দেখলে মজা পাবেন রে ভাই–ওর গায়ে কোনো কাপড় নেই–দিগম্বর। অন্যের স্ত্রীকে নেংটো দেখার সৌভাগ্য তো সবার হয় না। তাছাড়া রুবা অসম্ভব রূপবতী।

আমি হো হো করে হাসছি। এরকম একটা টেলিফোন কাউকে করতে পারলে হতো। তবে শুরুতে সবাই আমার কথা মন দিয়ে শুনলেও শেষটায়। তারাও হেসে ফেলত। মৃত মানুষ হেঁটে বেড়ায় না। পানি খায় না। অতীতে কখনো খায় নি। বর্তমানেও খাচ্ছে না। ভবিষ্যতেও খাবে না। আমার মাথায় কিছু হয়েছে। মাথায় রক্ত উঠে গেছে বা এই জাতীয় কিছু। এরকম এক গল্পও তো কোনো এক বিখ্যাত ডাক্তারকে নিয়ে প্রচলিত আছে। ডাক্তারটার নাম কি বিধানচন্দ্র না?

তিনি তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। রাত-দিন পড়াশোনা করেন। সেই বিশেষ ঘটনার দিন গভীর রাত পর্যন্ত পড়লেন। রাত দুটাির দিকে মনে হলো, ডেডবডি ডিসেকশান তো ভালো মতো শেখা হয় নি। মর্গে ডেডবডি আছে। একা একা গিয়ে কাটাকুটি করে দেখা যেতে পারে। যেই ভাবা সেই কাজ। নাইটগার্ডের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মর্গে ঢুকলেন। একটা ডেডবডি টেবিলে শোয়ানো। তিনি ঢোকামাত্র ডেডবডি উঠে বসল। অন্য যে-কেউ হলে ফিট হয়ে ধড়াম করে মেঝেতে পড়ে যেত। কিংবা দুর্বল হার্টের হলে হার্টফেল করে মরে যেত। বিধানচন্দ্রের বেলায় কিছুই হলো না। তিনি বুঝলেন, ভেইন থেকে দুষিত রক্ত মাথায় ঢুকে গেছে বলে হেলুসিনেশন হচ্ছে। তিনি

যে ভেইন মাথায় রক্ত দেয় সেটা বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, ডেডবডি আগের জায়গাতেই আছে। তিনি কাটাকুটি শেষ কবে হাত-মুখ ধুয়ে আবার পড়তে বসলেন এবং যথারীতি পরীক্ষায় ফার্স্ট বা সেকেন্ড এ জাতীয় কিছু হয়ে সবাইকে স্তম্ভিত করলেন।

নিতান্তই অবিশ্বাস্য গল্প। বিখ্যাত মানুষদের নিয়ে গল্প বানাতে হয়। এটিও বানানো হয়েছে। প্রথম কথা–ভেইন দিয়ে দূষিত রক্ত মাথায় যায় না। ভেইন থেকে দূষিত রক্ত বের হয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, মেডিকেল কলেজের মর্গে ডেডবডি ফেলে রাখবে, ছাত্ররা অফটাইমে কাটাকুটি করবে, তাও অসম্ভব একটা ব্যাপার। ডেডবডি এত সস্তা না। কাটাব জন্যে ব্যাঙ জোগাড় করতেও ঝামেলা হয়, আর এটা হলো মৃত মানুষ। কাজেই বোগাস। অল বোগাস।

আমার ঘরে যা ঘটছে তাও অল বোগাস। আমার মাথা উত্তেজিত। এর বেশি কিছু না। ব্রেইনে অক্সিজেনের অভাল হচ্ছে। লোহিত রক্তকণিকা বেশি বেশি করে অক্সিজেন মস্তিষ্কে পৌঁছাতে পারছে না। বারান্দায় বসে থাকলে একটা সুবিধা হবে–ফ্রেশ বাতাস পাব। ফ্রেশ বাতাস মানেই অক্সিজেন। ফুসফুস ভর্তি করে অক্সিজেন নিতে হবে।

শোবার ঘর থেকে খুটি খুঁট শব্দ হচ্ছে। মানেটা কী? ধড়াম করে আরেকটা শব্দ হলো। টেবিলল্যাম্পটা কি মাটিতে পড়ে গেল? আমার কি উচিত ভেতরে ঢুকে দেখা? না কি আমার উচিত বিশুদ্ধ বাতাসে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকা?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। শোবার ঘরে খটু খটু শব্দ বাড়ছে। এখন মনে হচ্ছে, হাতুড়ি দিয়ে কেউ মেঝেতে শব্দ করছে। খটু খটু খটু খটু। আরো খানিকটা ব্রান্ডি গলায় ঢাললে কেমন?

ওয়ান মোর পেগ। ওয়ান ফর দা রোড। না। আর না। যথেষ্ট হয়েছে–এই নুচুইসেন্স বন্ধ করতে হবে। পরিকল্পনা মতো এগিয়ে যেতে হবে।

ঝন ঝন শব্দে কলিংবেল বেজে উঠল। আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। কে আসবে এই সময়ে? এখন আমার করণীয় কী? শোবার ঘরের দরজা কি বন্ধ করে দেব? এটা কি অস্বাভাবিক হবে না? কে হতে পারে? আমার শ্বশুরবাড়ির কেউ না তো? রিটায়ার করার পর আমার শ্বশুর সাহেবের হাতে কোনো কাজকর্ম নেই বলে যে-কোনো তুচ্ছ ব্যাপারেও তাঁকে পাঠানো হয়। মেয়ের খোঁজ নেবার জন্য তাঁকে পাঠানো হয় নি তো?

আবার ঝনঝনি শব্দে কলিং বেল।

এ পরেও দরজা না খুললে সন্দেহজনক ব্যাপার হবে। আমি দরজা খুলে ছোটখাট একটা ধাক্কা খেলাম। রমনা থানার ওসি মকবুল সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গায়ে পুলিশের পুরো ইউনিফর্ম। মুখ হাসি হাসি।

মিজান সাহেবের খবর কী? আমাকে দেখে কি চমকে গেলেন না-কি? পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম– তারপর মনে হলো দেখে যাই আপনাকে। হঠাৎ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। একটু চিন্তাও হচ্ছিল। আছেন কেমন?

জি ভালো।

ভাবি ফিরেন নি এখনো?

জি না।

করছিলেন কী?

বারান্দায় বসেছিলাম।

ওসি সাহেব ঘরে ঢুকলেন। চারদিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, ভাবি বাসায় নেই, ভাবি থাকলে চা খেয়ে যেতাম।

আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি।

না থাক, থাক। কষ্ট করতে হবে না। বাহ বাসাটা তো সুন্দর সাজিয়েছেন। চারদিক একেবারে ঝকঝকি করছে। ময়লা জুতা নিয়ে ঢুকে তো লজ্জাই লাগছে।

আমার স্ত্রীর একটু শুচিবায়ুর মতো আছে।

তাই নাকি! বলেন কী? আমার স্ত্রীরও তো শুচিবায়ু।

ওসি সাহেব তাঁর স্ত্রীর সাথে আমার স্ত্রীর মিল পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন বলে মনে হলো। দাঁত-টাত কেলিয়ে...

চা এক কাপ পেলে মন্দ হতো না মিজান সাহেব, বানাবেন না কি?

আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। এই ব্যাটাকে চা খাওয়ানো এখন অত্যন্ত বিপদজনক। রুবা তার ঘরে নড়াচড়া করছে। একটা মৃত মানুষ নড়াচড়া করছে। বলতেও অস্বস্তি। তবে ব্যাপারটা ঘটছে। কীভাবে ঘটছে। আমি জানি না। তারচেয়েও বড় কথা, রুবা যদি ঘর থেকে বের হয়ে আসে তখন কী হবে? নগ্ন একটা মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বের হলো। ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসল। দৃশ্যটা কেমন হবে? ওসি সাহেব নির্ঘাৎ লাফিয়ে উঠবেন। পুলিশের লোেকেরা সাধারণত ভীতু প্রকৃতির হয়। নিশ্চয় তিনি কে কে বলে চেঁচিয়ে উঠবেন। তখন আমাকে কী করতে হবে? আমি কী বলব? বলব–এ আমার স্ত্রী। এর নাম রুবা। একে মেরে ফেলেছিলাম। কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে।

ওসি সাহেব সোফায় গা এলিয়ে বসতে বসতে বললেন, বাসায় কি আপনি একা?

কী উত্তর দেব দ্রুত চিন্তা করতে হচ্ছে। আমি কি বলব, বাসায় কেউ নেই? ধরা যাক তাই বললাম, তারপর শোবার ঘর থেকে খুটি খুঁট শব্দ হলো, তখন কী হবে?

আমি ওসি সাহেবের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের পানি চাপিয়ে দিলাম। চিনি ছাড়া চা নিয়ে দেব। বলব, চিনির কোটা পাচ্ছি না। এতে লাভ হবে। এক চুমুক দিয়ে উঠে পড়তে হবে। এই ভদ্রলোককে দ্রুত ঘর থেকে বের করে দিতে হবে। তবে ওসি সাহেব। আসায় একটা সুবিধাও হয়েছে। ভদ্রলোক দেখে গেছেন। আমি বাসাতেই আছি। স্বাভাবিকভাবেই আছি।

চা এনে ওসি সাহেবের সামনে রাখলাম। তিনি ওয়কিটকিতে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। খেজুরে আলাপ।

ভাই, চা নিন। ঘরে চিনি আছে কিন্তু চিনির কৌটাটা কোথায় জানি না।

চিনি নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি চায়ে চিনি খাই না।

ওসি সাহেব চাযে চুমুক দিয়ে বললেন, চা তো ভালো বানিয়েছেন। গুড়। মাঝে মাঝে আপনার বানানো চা এসে খেয়ে যেতে হবে।

জি আসবেন।

ওসি সাহেব সিগারেট ধরালেন। মনে হয় তিনি বেশ কিছু সময় এখানে কাটাবেন। শোবাব ঘরের দরজাটা কি এক ফাকে আটকে দেব? ওসি সাহেব বসেছেন শোবার ঘরের দরজার দিকে পেছন দিয়ে। কাজেই আমি যদি দরজা বন্ধ করে দেই, উনি বুঝতে পারবেন না।

আমি শোবার ঘবেব দরজাবি কাছে চলে এলাম। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজা টেনে বন্ধ করলাম। এক ফাঁকে দেখলাম রুবা মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে সে আমাকে দেখে হাসল। আমি ওসি সাহেবের সামনের চেয়ারে এসে বসেছি। ওসি সাহেব বললেন, কী এমন চুপচাপ কেন? বউ এক রাতের জন্য গেছে, এতেই আপনি যা মন খারাপ করেছেন– আশ্চর্য! হাসিমুখে কিছু বলুন তো শুনি।

শরীরটা ভালো লাগছে না। জ্বর জ্বর লাগছে।

এই জ্বরের নাম হলো বিরহ, জ্বর। শুনেন ভাই, একটা উপদেশ দেই–স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসবেন না। বেশি ভালোবেসেছেন কি মরেছেন–স্ত্রীকে আর পাবেন না। সবচে ভালো হয় যদি ভালো না বেসে পারেন। আচ্ছা উঠি।

বসুন না। একা আছি, কথা বলতে ভালো লাগছে।

বসলে হবে নারে ভাই। পুলিশের চাকরিতে বসাবসি বলে কিছুই নেই। ভাবি ফিবলে একটা খবর দেবেন।

জি আচ্ছা।

আমি ওসি সাহেবকে বাসার গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। তিনি যখন জিপে উঠতে যাচ্ছেন তখন এক মুহুর্তের জন্যে মনে হলো–আচ্ছা, ব্যাপারটা উনাকে খুলে বললে কেমন হয়! যদি তাকে বলি–ভাই, আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছিলাম, এখন দেখছি সে বেঁচে আছে। পানি খাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা বলছে। বিশ্বাস না করলে আপনি আসুন আমার সঙ্গে, আপনাকে দেখাই।

শেষ পর্যন্ত বলা হলো না। ওসি সাহেব জিপে উঠে বললেন, ভাই চলি? বলেই জিপ স্টার্ট দিলেন। আমি বেশ কিছু সময় ঠাণ্ডার মধ্যে একা একা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরে ফিরতে ভয় লাগছে। ইচ্ছা করছে পালিয়ে যেতে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া যাবে না। আমাকে ঘরেই ফিরতে হবে।

আচ্ছা রুবাকে কেন মারলাম? তাকে মারাটা কি খুব জরুরি ছিল?

রুবাকে মেরে ফেলার প্রথম চিন্তাটা আমার মাথায় আসে আমাদের বাসর রাতে। চিন্তাটা আসে খুব অল্পসময়ের জন্যে। ইংরেজিতে বলা যায়। It came as a flicber, আমার ধারণা সব মানুষের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে। মুহুর্তের জন্যে হলেও পাশের মানুষটাকে খুন করতে ইচ্ছা করে। এটা দোষের কিছু না; আমার মনে হয় এটাই স্বাভাবিক। বাসর রাতে কী ঘটল বলি। সারাদিনের ক্লান্তিতে আমি অবসন্ন। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। মাথার দুপাশের শিরা দপদপ করছে। দুপুরে কিছু খাই নি। ক্ষুধার কারণে বমি বমি লাগছে। এই অবস্থায় রুবা ঘরে ঢুকল।

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি–এত সুন্দর একটা মেয়ে! আগেও তো তাকে দেখেছি– এত সুন্দর লাগে নি! অন্য কোনো মেয়ে না তো?

রুবা আমার দিকে তাকিয়ে হড়বড় করে বলল, শুনুন, আমার প্রচণ্ড দাঁত ব্যথা করছে। আপনার সঙ্গে আজ রাতে কোনো কথাবার্তা বলতে পারব না। দয়া কবে কিছু মনে করবেন না। আমি চারটা পেইন কিলার খেয়েছি। আমার মাথা ঘুরছে।

আমি বললাম, ব্যথা কমেছে?

না কমে নি। ব্যথা আরো বেড়েছে। আপনি ডেনটিষ্ট হলে ভালো হতো। ফন্ট করে আমার দাঁত তুলে ফেলতেন। বলেই সে খিলখিল করে হাসতে লাগল। আমি অবাক হয়ে দেখছি— এত সুন্দর করে কেউ হাসে কী করে? হাসব দমকে তার মাথা থেকে শাড়ির আঁচল পড়ে গেল। তার ফর্স গলা বের হয়ে গেল। তার গলাটা কি অন্যদের গলার চেয়ে বেশি লম্বা?

আমার ক্ষণিকের জন্যে ইচ্ছা করল শক্ত করে দুহাতে তার গলা চেপে ধরতে। It came as a flicber.

রুবা অবশ্যি দাঁত ব্যথা নিয়েই সে-রাতে অনেক গল্প করল। বেশিরভাগ তার বন্ধু বান্ধবের গল্প। এক একজনের গল্প উঠলে সে উদ্ধৃসিত হয়ে যায়–জানেন, ওব মতো মানুষ হয় না। অসাধারণ! অসাধারণ!

আমি এক পর্যায়ে বললাম, আমি কিন্তু অসাধারণ না রুবা। আমি সাধারণ। রুবা হাই তুলতে তুলতে বলল, তা জানি।

কীভাবে জানো?

বললে রাগ করবেন না তো?

না রাগ করব না।

রাগ করলেও আমি অবশ্যি বলে ফেলব। আমি পেটে কথা রাখতে পারি না। আপনি যে খুব সাধারণ সেটা টের পেলাম যখন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল। কারণ আমার ভাগ্য খুব খারাপ, আমি এই জীবনে যা যা চেয়েছি কোনোটাই পাই নি। আমি সবসময় চেয়েছি অসাধারণ একজন স্বামী কাজেই আমি যে সাধারণ একজন স্বামী পাব সেটা তো ধরেই নেওয়া যায়। যায় না?

হ্যাঁ যায়।

এমনিতে আমি খুব সুন্দর। যে-ই দেখবে সে-ই বলবে সুন্দর। অথচ যখন আমাকে সুন্দর দেখানো দবকার তখন আমাকে দেখায় বাদরের মতো।

কখন তোমাকে সুন্দর দেখানোর দরকার?

একবার একটা ছেলে আমাকে দলবল নিয়ে দেখতে এলো। কী সুন্দর ছেলে। হ্যান্ডসাম, টল। প্লেন চালায়, পাইলট। আমি খুব যত্ন করে সাজিলাম। সাজার পর আয়নার তাকিয়ে দেখি কী যে বিশ্রী দেখাচ্ছে। এত সুন্দরী মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও ওরা আমাকে পছন্দ করল না।

তাহলে তো তোমার ভাগ্য আসলেই খারাপ।

আমি খুব ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারি। যে-ই শুনবে সে-ই মুগ্ধ হবে। টেলিভিশনে কবিতা আবৃত্তির অডিসন দিতে গেলাম— বেছে বেছে সেই দিনই আমার গলায় কী যে হলো, এক সঙ্গে দুতিন রকম স্বর বের হয়। টেলিভিশনের যে প্রযোজক অডিসিন নিচ্ছিলেন, তিনি হেসে ফেললেন। অন্যরাও হাসতে লাগল। শুধু আমি নিজের মনে তিন রকমের স্বরে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলাম। হিহিহি।

রুবা। আবারো হাসতে লাগল। আবারো তার শাড়ির আঁচল মাথা থেকে খসে। পড়ল। তখন আমার মনে হলো–এই অদ্ভুত মেয়েটা কি সত্যি বাকি জীবন আমার পাশে থাকবে?

আমি বললাম, তোমার দাঁত ব্যথা কি কমেছে?

রুবা হাসতে হাসতে বলল, আমার দাঁত ব্যথা ছিল না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না বলে, মিথ্যা করে বলেছি–দাঁত ব্যথা।

ও আচ্ছা।

কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না কেন সেটা শুনবেন?

বলো?

প্রথমবার আপনার চেহারা যতটা খারাপ লেগেছিল–আজ তার চেয়ে দশগুণ বেশি খারাপ লাগছে। এই জন্যেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আচ্ছা। আপনি কি কবিতা শুনতে ভালোবাসেন?

না।

জানতাম ভালোবাসেন না। আমি যে-সব জিনিস পছন্দ করি আমার স্বামী সে-সব পছন্দ করবেন তা কী করে হয়। আপনি আবার রাগ করছেন না তো?

না।

আমার কিন্তু অনেক ছেলেবন্ধু আছে। আমি ওদের সঙ্গে খুব ঘোরাঘুরি করি। আপনি আবার বলবেন না–ওসব চলবে না। গৃহপালিত পশু হয়ে যাও। বলবেন না তো?

না।

তাহলে এক মিনিটের জন্যে আমার হাতটা ধরতে পারেন।

রুবা হাত বাড়িয়ে দিল। এমন চমৎকার একটা মেয়েকে ভেবে চিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছি। কেন করলাম? আমি কি অসুস্থ? আমি কি সাইকোপ্যাথ?

না, আমি অসুস্থ না। আমি সাইকোপ্যাথও না। আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। এই মেয়েকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার ছিল না। ও সরে যাচ্ছিল। আমি তা হতে দিতে পারি না!

এখন সে আর কোথাও যেতে পারবে না। কোনো বন্ধু এসে এখন আর তার কবিতা শুনবে না। বা কারো সঙ্গে বুড়িগঙ্গায় জোছনা দেখতে যেতে পারবে না।

আচ্ছা আজ কি জোছনা আছে? আকাশ আলো হয়ে আছে, কিন্তু আমি কোনো চাঁদ দেখছি না।

ঘরে ফেরা দরকার, ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। রুবার মুখোমুখি হতে ভয় করছে।

আমি ঘরে ঢুকলাম। বসার ঘরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হলোশোবার ঘরের দরজাটা না খুললে কেমন হয়? থাকুক রুবা বন্ধ ঘরে। আমি বাতটা সোফায় শুয়ে কাটিয়ে দেই। ডেডবডি সরানোর কাজ রাতের বেলা না করে দিনে করাই ভালো। দিনে চারদিকে প্রচুর মানুষ থাকে। সবাই ব্যস্ত। কেউ কারো দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকায় না। রাতে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে।

শোবার ঘরের নিবে হাত রাখতেই ভেতরে ঝন ঝন শব্দে কাচের কী যেন ভাঙল। কী হচ্ছে? এসব কী হচ্ছে? আমি খুব সাবধানে দরজা ফাঁক কবলাম যেন প্রয়োজনে ঝাট করে দরজা বন্ধ করে দেয়া যায়।

শোবার ঘরের মেঝেতে রুবা বসে। পানির গ্রাসের ভাঙা টুকরো জড়ো করার চেষ্টা করছে। গ্রাসটা টেবিল থেকে নিচে পড়ে ভেঙেছে। আমি তার শব্দই শুনেছি। চিণ্ডাভাবনা না করেই বললাম, কী হয়েছে?

রুবা জড়ানো গলায় বলল, গ্লাস।

শোন রুবা, উঠে দাড়াও। গ্লাসের ভাঙা টুকরা জড়ো করতে হবে না। উঠে দাড়াও। দাড়াও বললাম।

সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে–পারছে না। টেনে তোলার জন্যে অসহায় ভঙ্গিতে একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। এটা কি কোনো ট্রিকস? আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা? আমি তার হাত ধরব, আর সঙ্গে সঙ্গে সে জাপ্টে ধরবে আমাকে। হরর ষ্টোরিতে এরকম থাকে। মৃত মানুষ জীবিত মানুষকে মরণ আলিঙ্গনে জাপ্টে ধরে। রুবা। আবার বলল, ধর, আমাকে টেনে তোল।

আমি ধরলাম এবং টেনে তুললাম। হরর গল্পের মতো সে আমাকে মরণ আলিঙ্গনে বাঁধিল না। পাড় মাতালরা যেমন হেলতে দুলতে থাকে সেও তেমনি হেলছে দুলছে। তার হাত শীতল, বরফের মতোই শীতল। তার হার্ট কি বিট করছে? এই মুহূর্তে তার বুকে হাত

রেখে কিংবা নাড়ি ধরে তা বোঝা যাবে না। কারণ ধ্বক ধ্বক শব্দে আমার নিজের হোটই কাঁপছে। সেই শব্দ অন্য সব শব্দকে ঢেকে ফেলবে।

রুবা।

উঁ।

তুমি মরে গেছ। বুঝতে পারছি?

উঁ।

তুমি কীভাবে কথা বলছি, কীভাবে হাঁটাহাঁটি করছ, আমি জানি না। তোমার কেমন লাগছে বলো তো?

উঁ,

উঁ না। কথা বলো। লেট আস টক। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছি?

উঁ।

বলে আমার নাম কী? বলো, আমার নাম বলে।

মিজান।

এই তো হয়েছে। এসো এখন এই চেয়ারটায় বোস। নাও, এই চাদর দিয়ে গা ঢাক। উলঙ্গ মানুষ দেখতে ভালো লাগে না। রাস্তায় নগ্ন পাগলীদের দিকে কেউ তাকায় না। এখন আমার কথাবা জবাব দাও–তোমার এখন কেমন লাগছে?

ভায।

ভয় লাগছে?

হুঁ।

ভয় লাগবে কেন? ভয় লাগার কী আছে? একজন মৃত মানুষের ভয় লাগার কিছু নেই। তয় জীবিত মানুষের। মৃত মানুষের কোনো ভয় নেই। তাদের জগৎ ভয়শূন্য। You understand?

বাতি জ্বালাও।

বাতি জ্বালাব?

হুঁ।

রুবা, ঘরে বাতি জ্বলছে। একটা টিউব লাইট জ্বলছে। টেবিল ল্যাম্পও জ্বলছে।

অন্ধকার।

তোমার কাছে অন্ধকার লাগছে?

হুঁ।

আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

ছায়া ছায়া।

শোন রুবা, আমি তোমাকে মেরে ফেলেছি।

জানি।

তুমি জানো?

হুঁ।

আমার ওপর কি তোমার কোনো রাগ আছে?

না।

রাগ থাকলে বলো।

না।

তুমি কি আমাকে খুন করতে চাও?

না।

রুবা! তুমি কি প্রতিশোধ নিতে চাও?

না।

গুড ভেরি গুড। বুঝলে রুবা, একটা কোনো সমস্যা হয়ে গেছে। মৃত মানুষের কথা বলার কোনো কারণ নেই–কিন্তু তুমি কথা বলছি। কীভাবে বলছ?

আমি জানি না।

তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?

হুঁ।

এসো, শুয়ে থাক। বিছানায় শুয়ে থাক।

আচ্ছা।

আমি রুবার হাত ধরে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। গায়ে চাদর টেনে দিলাম। সে অদ্ভুত শব্দ করছে। খুন খুন শব্দ।

কী হয়েছে?

ভয় লাগে।

শোন রুবা, ভয়ের কিছু নেই। আমি তোমার পাশে বসে আছি।

আচ্ছা।

দাও, তোমার হাত দাও। তোমার হাত ধরে বসে থাকব।

আচ্ছা।

পানি খাবে?

না!

পানি খাবে না?

খাব।

রুবাকে কড়া ঘুমের ওষুধ কিছু খাইয়ে দিলে কেমন হয়? যে কাজটা আমি করতে পারি নি ঘুমের ওষুধ সেটা করবে। হাই ডোজের হিপনল আমার কাছে আছে। পানিতে গুলে সরবতের মতো করে খাইয়ে দিতে পারলে আর দেখতে হবে না। রুবা খেতে আপত্তি করবে বলে মনে হচ্ছে না। মবে গেলে তার জন্যেও ভালো, আমার জন্যেও ভালো!

ড্রয়ার খুলে কুড়িটা টেবলেট পেলাম। আধগ্লাস পানিতে কুড়িটা টেবলেট, ঘন পেস্টের মতো তৈরি হলো। চেখে দেখি তিতা এবং মিষ্টি মিলে বিশ্রী স্বাদ। এই জিনিস কেউ খেতে পারবে না, কিন্তু রুবা পারবে। অবশ্যই পারবে। সে মানুষের স্তরে এখন নেই। সে এখন অন্য কোনো স্তরে। এই স্তরে স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ বলে কিছু থাকার কথা না।

আচ্ছা, আমি এইসব কী ভাবছি? এখন ভাবাভাবির সময় না। সময়টা হলো কাজের। টাইম অব অ্যাকশন। দেরি করা যাবে না। সময় নষ্ট করা যাবে না। যা করার খুব ভেবে-চিন্তে করতে হবে। সকাল আটটার আগে ডেডবডি সরিয়ে শ্বশুরবাড়িতে যেতে হবে। শ্বশুর সাহেবকে ঘুম থেকে তুলে কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে হবে।–রুবা এখনো ফিরে নি। শ্বশুরবাড়ি থেকেই ওসি সাহেবকে টেলিফোন করতে হবে।

আমি গ্রাস হাতে রুবার কাছে গেলাম। রুবা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ তুলে আমাকে দেখল। না।

রুবা নাও, খেয়ে ফেলে।

সে গ্লাস নেবার জন্যে হাত বাড়াল না। বাড়বে না জানতাম। সেই বোধ এখন তার নেই। আমাকেই খাইয়ে দিতে হবে। আমি তাকে উঠে বসালাম, তার মুখের কাছে গ্লাস ধরলাম। সে খাচ্ছে। চুকচুক করে খাচ্ছে।

খেতে মজা না?

উঁ।

সূচিপত্র

খাও, আরাম করে খাও। খেয়ে ঘুমিয়ে থাক।

উঁ।

তুমি মেয়ে খারাপ না। মেয়ে ভালো।

উঁ।

শুধু ভালো মেয়ে বললে কম বলা হয়, তুমি বেশ ভালো মেয়ে... ..বুঝতে পারছ?

হুঁ।

আমি যা করেছি। বাধ্য হয়ে করেছি। ঈর্ষার কারণে করেছি। তোমাল নানান ধরনের বন্ধু-বান্ধব। ওদের সঙ্গে তুমি কত গল্প কর, কত হাসোহাসি। আমার সঙ্গে কোনো গল্প কর না। হুঁট করে ওদের সঙ্গে বের হয়ে যাও, আমার সঙ্গে যাও না। এ জন্যেই রাগ হতো।

হুঁ।

বেশি রাগ না, অল্প রাগ। অল্প রাগটা বাড়তে বাড়তে এরকম হয়ে গেল।

বুঝতে পারছি?

হুঁ।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তাছাড়া আমার চেহারা ভালো না। মুখ খানিকটা বাঁদরের মতো, দাঁত বের হয়ে থাকে–এই নিয়ে আমার মধ্যে এক ধরনের কমপ্লেক্স আছে। আমার ধারণা, কেউ আমাকে সহ্য করতে পারে না। রুবা, তুমি কি আমার কথা শুনতে পোচ্ছ?

হুঁ।

অফিসেও কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। প্রয়োজনে কথা বলে, অপ্রয়োজনে কথা বলে না। শুধু নুরুজ্জামান সাহেব মাঝে মাঝে বলেন। আর কেউ না। তুমিও তাই কর। কাজেই আমার ধারণা হয়েছিল–তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। বুঝতে পারছি?

হুঁ।

এই জন্যেই আমি তোমাকে মেরে ফেলেছি। যাতে কখনো আমাকে ফেলে চলে যেতে না পার। বুঝতে পারছি কি বলছি?

হুঁ।

কাজটা অন্যায় হয়েছে। খুব অন্যায়। পৃথিবী জায়গাটা সুবিধার না। এখানে মাঝে মাঝে অন্যায় না।

হুঁ।

তোমার জন্যে আমার এখন খারাপ লাগছে। খারাপ লাগা উচিত না, কিন্তু লাগছে।

আচ্ছা।

আমি খুব শক্ত মানুষ, বুঝলে রুবা, অসম্ভব শক্ত মানুষ। মন খারাপ কী ব্যাপার তা আমি জানি না। আমি কোনোদিন কাঁদি না। কিন্তু তোমার অবস্থা দেখে খারাপ লাগছে।

হুঁ।

আমার মার কথা কি আমি তোমাকে কোনোদিন বলেছি রুবা?

না।

বলি নি। আমি কাউকে বলি নি। আমি কি আমার বড়বোনের কথা বলেছি?

না।

আমি কাউকেই কিছু বলি না। আমি সব নিজের মধ্যেই রেখে দেই।

হুঁ।

আমার বড়বোনের নাম কী বলো তো?

রুবা।

ঠিক বলেছ, রুবা। তোমাদের দুজনের মধ্যে খুব মিল। আমার বড়বোন ঘুমের মধ্যে হাঁটফেল করে মারা গিয়েছিল। ডাক্তারের রিপোর্টে তাই আছে। আসল ব্যাপারটা শুনবে?

রুবা শব্দ করল না। আমি বললাম, কিছু খাবে?

না।

তুমি এখন আরাম করে ঘুমাও। শুয়ে পড়। এসো শুইয়ে দেই।

আমি রুবাকে শুইয়ে দিলাম। সে কোনো আপত্তি করল না। মুখ এখনো হা হয়ে আছে, ওষুধের গুঁড়া লেগে আছে। কুৎসিত দেখাচ্ছে। চোখ খোলা। মাছের মতো চোখ, চোখে পলক পড়ে না।

আমি রুবার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, চোখ বন্ধ করে ঘুমুতে চেষ্টা কর। কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়েছি–ভালো ঘুম হবে। যা ঘটার ঘুমের মধ্যেই ঘটবে। তুমি কিছু টের পাবে না। চোখ বন্ধ করা।

রুবা চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করছে। পারছে না। আমি চোখের পাতা টেনে দিলাম। রুবার গায়ের চামড়া খসখসে হয়ে গেছে। দেখাচ্ছে মসৃণ কিন্তু হাত রাখলেই খসখসে। ভাব! অনেকটা সাপের গায়ের চামড়ার মতো। দূর থেকে কী মসৃণ দেখায়, কিন্তু হাত দিলেই খসখসে। আমি একবার সাপের গায়ে হাত দিয়েছিলাম। সাপুড়ে সাপের খেলা দেখাতে এসেছে। সবাই খেলা দেখছি। আমি ভয়ে অস্থির হয়ে বাবার কোলে বসে আছি। সাপ এক একবার ফণা তুলছে, আমি আতঙ্কে জমে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠছি। বাবা

এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, সাপ অতি নিম্নশ্রেণীর একটি প্রাণী। একে ভয়ে পাবার কিছু নেই। বিষদাঁত ভাঙা সাপ কেঁচোর কাছাকাছি। খোকন, তুমি সাপেব গায়ে হাত দাও। দাও হাত। হাত দিয়ে দেখ; একবার এর গায়ে হাত দিলেই তোমার ভয় ভেঙে যাবে। দাও, হাত দাও।

আমাকে হাত দিতে হলো। ধবিধার কথা অগ্রাহ্য করার সাহস আমাদের ভাইবোনদের কোনো কালেই ছিল না।

সাপের গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলাম— কী খসখসে চামড়া!

বাবা হাসিমুখে বললেন, ভয় ভেঙেছে খোকন?

আমার ভয় ভাঙে নি, তবু আমি মাথা নাড়লাম। বাবা হৃষ্ট স্বাবে বললেননিম্নশ্রেণীর প্রাণিদের ভয় পেতে নেই, ভয় যদি পেতেই হয় মানুষকে ভয় পাবি। মানুষ অতি উচ্চশ্রেণীর প্রাণী মানুষকে ভয় পাওয়ার মধ্যেও আনন্দ আছে।

রুবা চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে কি? আমি তার গায়ে হাত রেখে বললাম, আমি কিছু খেয়ে আসি। আমার খিদে পেযেছে। একগাদা পোলাও খেয়েছি, তারপবেও খিদেয় মরে যাচ্ছি; ফ্রিজে কি খাবার কিছু আছে?

হুঁ।

আমি খাবার ঘরে ঢুকলাম। এই ঘরের দেয়ালে বিবাট একটা ঘড়ি আছে। ঘড়িতে দুটা বাজে। আশ্চর্য, আমি তো বিরাট একটা ভুল করেছি। খাবার ঘরে বাতি জ্বলছে, শোবার ঘরে বাতি জ্বলছে, বারান্দায় বাতি জ্বলছে, বসার ঘরে বাতি জ্বলছে। পুলিশ কেইস হলে অনেকেই সাক্ষ্য দেবে–অনেক রাত পর্যন্ত ঐ বাড়িতে বাতি জ্বলছিল।

খাবার ঘর ও বসার ঘরের বাতি নিভালাম। একসঙ্গে সবগুলো বাতি নেভানোও ঠিক না। সন্দেহ হবে। ফ্রিজ খুললাম। অনেক খাবারই আছে। পলিথিনের ব্যাগে মোড়া স্যান্ডউইচ, লাড্ডু, রসমালাইয়ের একটা হাঁড়ি।

একটা লাড্ডুর অর্ধেকটা মুখে দিতেই আমার খিদে চলে গেল, বমি বমি ভাব হলো। প্রচুর খাওয়া হলে যেমন বমি ভাব হয় সে-রকম।

আমি শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে এক গ্লাস ঠাণ্ড পানি নিয়ে বসলাম। রুবার ঘরের বাতি এখনো জ্বলছে। বাতি নিভিয়ে দেওয়া দরকার। বাতি জ্বালানো থাকলে কেউ ঘুমুতে পারে না। রুবা তো একেবারেই পারে না। যদিও এই রুবা হলো অন্য রুবা। তবুও দীর্ঘদিনের একটা অভ্যাস।

রুবার ঘরে ঢুকলাম। সে ঠিক আগের মতো শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। চোখ এখনো খুলে নি। এটা একটা ভালো লক্ষণ। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ডেকে দেখব?

থাক, ডাকার দরকার নেই। কাঁটায় কাটায় এক ঘণ্টা পর এসে দেখব কী ব্যাপার। এই এক ঘণ্টা আমি বিশ্রাম নেব। বারান্দায় চেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে থাকব। আমার নিজের

বিশ্রাম দরকার। অস্বাভাবিক ব্যাপার যা ঘটছে বিশ্রাম নিলে সেসব পুরোপুরি বন্ধ হতে পারে।

আমি বারান্দায় এসে বসলাম। জমিয়ে ঠাণ্ডা পড়েছে। বারান্দা চিক দিয়ে ঢাকা, তারপরেও চিকের ফাঁক দিয়ে শীতল হওয়া আসছে। একটা চাদরে গা ঢেকে বসা দরকার ছিল। পা তুলে বসলাম। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করতে হবে– নিয়তো শেষটায় পাগল হয়ে যাবে। বারান্দার বাতি নেভানো, তবু খানিকটা আলো আসছে। চাঁদের আলো? যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ। কে বলত এ কথাটা? রুবা না? হ্যাঁ রুবা।

একদিন অফিস থেকে ফিরতে বেশ দেরি হলো–ইয়ার এন্ডিং-এর কামেলা। বাসায় ফিরেছি। রাত এগারোটায়। কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিল। আমি ঘরে ঢুকে দেখি বিরাট উৎসব। রুবার বন্ধু-বান্ধবরা বারান্দায় গোল হয়ে বসে আছে। আজ না কি চাঁদেব পঞ্চমী। চাঁদ ডুবে গেলে জীবনানন্দের আট বছর আগের একদিন কবিতা পড়া হবে।

রুবা পরীর মতো সেজে বসে আছে। গলায় ফুলের মালা। খোপায় ফুল। রুবা এসে বলল, তুমি চট করে হাত-মুখ ধুয়ে আমাদের সঙ্গে এসে বসো তো।

কেন?

সুব্রত এসেছে।

সুব্রতটা কে?

আশ্চর্য! সুব্রতকে চেন না? বিখ্যাত আবৃত্তিকার। নান্দনিক গোষ্ঠীর সুব্রত দে। ও আজ কবিতা পাঠ করবে।

আমি একাউন্টেন্ট মানুষ। আমি কবিতার কী বুঝি? তোমাকে কিছু বুঝতে হবে না। তুমি চুপচাপ বসে থাকবে। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

তিনটা প্যারাসিটামল খাও। আমি গরম এক কাপ চা বানিয়ে দিচ্ছি। চা খাও। চা খেয়ে আমাদের সঙ্গে বসো। জীবনানন্দ দাশের কবিতা তোমার ভালো লাগবে।

রুবা-প্রায় জোর করেই আমাকে বারান্দায় নিয়ে গেল। রুবার বন্ধু-বান্ধবরা একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। সুব্রত নামের ছেলেটা আমাকে পাত্তাই দিল না। সে পৌষমেলার কী এক গল্প করছিল–সেই গল্পই করতে লাগল। আমি বোকার মতো খানিকক্ষণ বসে। থেকে শোবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন শুনি কবিতা পাঠ হচ্ছে। সুব্রত না, কবিতা পড়ছে রুবা–

যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হলো তার সাধ;
বধু শুয়েছিল পাশে–শিশুটিও ছিল;
প্রেম ছিল, আশা ছিল–জ্যোৎস্নায়–তবু সে দেখিল
কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙ্গে গেল তার?...

কবিতা শুনতে শুনতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। গাঢ় গভীর ঘুম। এমন গাঢ় ঘুম অনেক দিন ঘুমাই নি।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

এখনো ঘুম পাচ্ছে। চোখ ভেঙে ঘুম নামছে। ঘুমিয়ে পড়াটা কি ঠিক হবে? যদি সময়মতো ঘুম না ভাঙে! যদি জেগে উঠে দেখি দশটা বেজে গেছে–চারদিক আলো হয়ে আছে।

খোকনা! খোকন!

আমি ধড়মড় করে উঠলাম। বাবার গলা। শ্লেষ্মা জড়ানো ভারী স্বর। ভুল হবার কোনো কারণ নেই। বাবার গলা শুনব কেন? তিনি বেঁচে নেই। ডেড এন্ড গান। আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি। বাবা আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যেমন দাঁড়ান, খানিকটা কুজো হয়ে একটু বুকে এসেছেন। গা থেকে কড়া তামাকের গন্ধ আসছে। তাঁর গায়ে হলুদ কোট। কোটের তিনটা হলুদ বোতামের একটা লাল। হলুদ বোতাম একটা খুলে পড়ে গিয়েছিল। মা কোথেকে যেন একটা লাল বোতাম এনে লাগিয়ে দিলেন। বাবা নির্বিকার। সেই কোট পরেই স্কুলে ক্লাস নিতে যান।

খোকন, ওঠ্ ওঠ্। তোর এক ঘণ্টা ঘুমুবাব। কথা, তুই ঝাড়া দেড় ঘণ্টা ঘুমুচ্ছিস। ওঠ ওঠ। শেষে একটা বিপদ বাধবি।

বাবা আপনি?

হ্যাঁ, আমি। বারান্দায় বসে বসে ঘুমুচ্ছিস কোন আক্কেলে? শেষটায় নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখবি না? নিজের শরীরের যত্ন নিজে না করলে কে করবে? বৌ-মার অবস্থাও তো ভালো না।

আমি কিছুটা কৌতূহল, কিছুটা ভয় নিয়ে বাবাকে দেখছি। শেভ করেন নি, গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা সাদা-কালো দাড়ি। প্রতি দিন শেভ করা বাবার ধাতে ছিল না। প্রতি তিনদিন পর পর শেভ। পয়সা বাঁচানো।

হাঁ করে কী দেখছিস রে খোকন?

আপনাকে দেখছি।

দেখাদেখির কিছু নেই রে বাবা। সময় সংক্ষেপ। এখন কাজে লেগে পড়তে হবে। তুই একা পারবি না বলেই তোকে সাহায্য করতে এসেছি।

আমাকে সাহায্য? আমাকে কী সাহায্য?

বৌ-মার ডেডবডি সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে না? তুই একা পারবি?

আমি হেসে ফেললাম। আমার বাবা, ঠাকেরোকানা স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব এসেছেন আমাকে সাহায্য করতে। পুরো ব্যাপারটা এক ধরনের হেলুসিনেশন। কিংবা আমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি। মানুষ যখন ভয়াবহ কোনো সমস্যায় পড়ে তখন স্বপ্নে সে রিলিফ পায়। এও এক ধরনের রিলিফ। আমাকে সাময়িক রিলিফ দেওয়াবা জন্যে আমার বাবা আজহার উদ্দিন সাহেব চলে এসেছেন। কেমন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলছেন, তোকে সাহায্য করতে এসেছি–হা হা হা।

হাসছিস কেন রে খোকন? এটা কি হাসির সময়?

আপনি একা এসেছেন কেন বাবা? মাকে নিয়ে এলেন না কেন?

তাকে আনব কী করে? তাকে কুকুরে কামড়াল না? ওর কি চলাফেরার অবস্থা আছে! তুই অকারণে দেরি করছিস। আয় আমরা কাজে নেমে পড়ি।

আচ্ছা বাবা, আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

মাথা খারাপ হবে কেন? আমার তো পাগলের বংশ না। এই বংশে কোনো পাগল নেই। আমাদের অতি উচ্চ বংশ।

বাবা, আপনাকে দেখে ভালো লাগছে। বসুন। কিছু খাবেন বাবা গরম চা কিংবা কফি?

চা খাওয়া যায়। শীতটাও বেজায় নেমেছে–তুই পাতলা একটা শার্ট গায়ে দিয়ে ঠাণ্ডায় বলে আছিস কীভাবে?

আমি আবারো হো হো করে হাসলাম। নিজের হাসির শব্দে নিজেই চমকালাম। কী আশ্চর্য কণ্ড ঘটছে স্বপ্নে, বাবাকে দেখছি। একেবারে বাস্তবের মতো স্বপ্ন। কিংবা কে জানে সত্যি সত্যি বাবা হয়তো পরলোক থেকে চলে এসেছেন। এখন পিতা-পুত্র মিলে ডেডবডি সরাব–হা হা হা।

হাসছিস কেন রে খোকন?

এমনি হাসছি।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

চা বানালে তাড়াতাড়ি বানা। আদা থাকলে এক টুকরা আদা দিয়ে দিবি। আমার গলা বসে গেছে।

বাবা ই ই করে গানের কী একটা কলিও যেন ভাজলেন। সখি হে সখি হে ধবনের গান। এ তো দেখি ভালো যন্ত্রণা হলো।

আমি বারান্দা থেকে বসার ঘরে ঢুকলাম, বাবা পেছনে পেছনে এলেন। শব্দ কবে হাই তুল্য লন, আঙ্গুলো তুড়ি বাজলেন। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, এটা যদি স্বপ্ন হয়ে থাকে তা হলে বেশ কঠিন এবং জটিল স্বপ্ন। Powerful dream.

বাবা আনন্দিত গলায় বললেন, ঘর-দোয়ার তো খুব ঝকঝকে।

আমি বললাম, আপনার বৌমার শুচিবায়ুর মতো আছে।

আগ বলবি তো–আমি ধুলাপায়ে ঢুকেছি।

কোনো সমস্যা নেই, ও তো আর কিছু বুঝতে পারছে না।

তাও সত্যি। তুই ভালো কথা মনে করেছিস। এখন মূল বিষয়ে আয়–ডেডবডি কীভাবে সরাবি বলে ঠিক করেছিস। পদ্ধতিটা কী?

ডিসপ্যাবসান পদ্ধতি।

সেটা কী?

সত্যি জানতে চান?

অবশ্যি জানতে চাই।

ডেডবডিটা, টুকরো টুকরো কবে বড় একটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া। পূব ভালো পদ্ধতি। ফুল প্রুফ।

আমার কাছে তো খুব ভালো পদ্ধতি বলে মনে হচ্ছে না। নোংরা পদ্ধতি বলে মনে হচ্ছে। কাটাকুটি কে করবে? তুই?

হুঁ।

পারবি? এত দিনের চেনা একটা মেয়ে। তার উপর প্রচণ্ড রাগ থাকলে অবশ্যি পারবি। আছে প্রচণ্ড রাগ?

কিছুটা আছে।

তোর বলার ভঙ্গি থেকে মনে হয় রাগ কমে গেছে। এখন তো কাটাকুটি করতেই পাববি না। তাছাড়া রক্ত টক্ত বের হয়ে বিশ্রী অবস্থা হবে। ডিসপারসান পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি নেই? তোর মাথা তো বেশ পরিষ্কার। চিন্তা ভাবনা কবে কিছু বের করতে পারিস না?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

বাবা আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মোটা চশমার আড়ালে বাবার চোখে আগ্রহ ঝিকমিক করছে। সেই চোখ দেখে আমার পেটে হাসি গুড়গুড়িয়ে উঠছেকী বিশ্রী ঝামেলা তৈরি হয়ে গেছে। আমি আমার চোখের সামনে আমার নিজের মনেরই একটি অংশকে দেখতে পাচ্ছি। সেই অংশটি বাবাব রূপ ধরে সামনে এসেছে। আমাকে তান দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি জানি যথাসময়ে সে নিজ মূর্তি ধরবে।

খোকন!

জি বাবা।

কই চা খাওয়াবি বলেছিলি তার কী করলি!

চা বাবা আপনি খাবেন না–কারণ আপনার আসলে কেনো অস্তিত্ব নেই। আমি যদিও আপনাকে দেখছি, আসলে আপনি আমার সমানে নেই। আমার মাথার নিউবোনে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে বলে আমি আজগুবি সব ব্যাপার দেখতে শুরু করেছি।

তোর মাথায় কী হয়েছে?

কী হয়েছে আমি জানি না। বড় কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলে তিনি হয়তো বলতে পারতেন। তা তো সম্ভব না।

বাবা চিন্তিত গলায় বললেন, বৌমার মৃত্যু তোকে খুব এফেক্ট করেছে। নিজের হাতে খুন করেছিস তো, এই জন্যেই বেশি লাগছে। ভাড়া করা লোক পেলি না? ওরা যা করার চুপি চুপি করত— তুই টাকা দিয়ে খালাস। মানুষ মারতে আজকাল কত নেয়? রেট কত?

চুপ করুন তো বাবা।

তুই নিজ হাতে খুন করেছিস বলে কি তোর কোনো অপরাধ বোধ আছে?

না।

গুড। না থাকাই উচিত। মৃত্যু হলো কপালের লিখন। যার যেভাবে মৃত্যু লেখা সেভাবেই হবে। তুই নিমিত্ত মাত্র, বৌমার কপালে লেখা ছিল তোর হাতে মৃত্যু। তুই হাজার চেষ্টা করেও সেই লেখা ফেরাতে পারতি না। কাজেই যা হবার হয়েছে। বি হ্যাপি।

বাবা আবার গুন গুন শুরু করলেন–সখি হে! সখি হে। বাবার প্রিয় গান। গান থামিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, বি হ্যাপি মাই সান।

আমি হ্যাপিই আছি। আপনি চলে যান।

চলে যাব?

হ্যাঁ চলে যাবেন। অবশ্যই চলে যাবেন।

তোকে এমন ব্যামেলায় ফেলে যাব?

হ্যাঁ যাবেন। আমার ঝামেলা আমিই মেটাব। ঝামেলা কবার সময় তো আব্ব আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করে করি নি।

তবু... ..তুই আমার ছেলে। তোর কষ্ট দেখে কষ্ট হয়।

বাবা, আমার কোনো কষ্ট নেই। আপনাকে হাতজোড় কবে অনুরোধ করছি আপনি চলে যান।

আচ্ছা বেশ যাচ্ছি–বৌমার ডেডবডি কীভাবে সরাবি একটু বলে দে। তোর মাকে বলতে হবে তো। গেলেই জিজ্ঞেস করবে।

একটা বস্তায় ভরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসব।

কোথায় ফেলবি?

জানি না কোথায়। এখনো ঠিক করি নি।

আজে বাজে কোনো জায়গায় ফেলিস না। এত ভালো একটা মেয়ে।

ভালো মেয়ে।

অবশ্যই ভালো মেয়ে। সে যে ভালো মেয়ে সেটা আমি যেমন জানি, তুইও জানিস। জানিস না?

বাবা চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলেছেন। তাকাচ্ছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। বাবার চোখে এই দৃষ্টি সহ্য করা সম্ভব না। কী শীতল, কী ঠাণ্ডা চোখ!

খোকন!

জি বাবা।

তুই অসুস্থ। ভয়ঙ্কর অসুস্থ। জন্ম থেকেই তুই অসুস্থ ছিলি। আমরা বুঝতে পারি নি। তুই যে কাণ্ডটা করেছিস, অসুস্থ বলেই করেছিস। তোর এই অসুখ আরো বাড়বে–তুই এমন কাণ্ড আরো করবি। সেটা কি ঠিক হবে?

ঠিক হবে কি হবে না, তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি কেউ না।

আমি কেউ না তা কী করে বললি রে ব্যাটা? আমি তোর বাবা না? মনে নেই একবার তোর পেটে যন্ত্রণা হলো–সারারাত তোকে কোলে নিয়ে হেটলাম। তোর মা বলল, কতক্ষণ আর তুমি হাঁটবে–আমার কোলে দাও। আমি খানিকক্ষণ হাঁটি। কিন্তু তুই মার কোলে যাবি না, বানরের বাচ্চার মতো আমার গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাইলি–ভুলে গেছিস?

না। ভুলি নি।

তোকে কোলে নিয়ে হাঁটতে আমার কোনো কষ্ট হয় নি। তুই পেটের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলি, সেই জন্যে কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমি আল্লাহর কাছে মানত করলাম তোর পেটের ব্যথা সারলে

আমি একশ রাকাত নামাজ পড়বা। মানতটা করার সঙ্গে সঙ্গে তোর পেটের ব্যথা কমে গেল।

আপনি মানত অদায় কবেছিলেন?

অবশ্যই। তোকে তোর মার কাছে দিয়ে জায়নামাজে বসলাম। নামাজ শেষ করে। তারপর উঠলাম।

আপনি এত তালো মানুষ কিন্তু আপনার ছেলে এত খারাপ হলো কেন?

সেটা তো বাবা বলতে পারি না। জগৎ বড়ই বিচিত্র। তোর মার কথাই ধর। এমন একজন মহিলা, অথচ কী কুৎসিত মৃত্যু হলো। যে কুকুরটাকে এত আদর করত, তার মরণ হলো কুকুরের হাতে।

আপনি চলে যান তো বাবা।

আচ্ছা যাচ্ছি। বৌমাকে একবার দেখে যাব না?

তাকে দেখাব কিছু নেই।

আহা, একটু দেখে যাই। চোখের দেখা আর কিছু না। মাথা হাত বুলিয়ে আদর করে চলে যাব। ওর পেটে যে একটা বাচ্চা ছিল সেটা বোধহয় তোকে বলে নি। না—কি বলেছে?

আমি কিছু বললাম না। এক দৃষ্টিতে বাবাকে দেখছি। এ কে? সত্যি কি বাবা এসেছেন? না মাথার ভেতরের কোনো ভ্রান্তি উঠে এসেছে?

বাবা হাই তুলতে তুলতে বললেন, দুমাসের একটা বাচ্চা ছিল–বৌমা ভেবেছিল তোর জন্মদিনে বলবে। তোকে অবাক করে দেবে। কবে যেন তোর জন্মদিন?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা হাসিমুখে বললেন–আমার মনে হয় আজই তোর জন্মদিন। আমার অবশ্যি দিন তারিখ মনে থাকে না। গুবলেট করে ফেলি। তোর মা ঠিক ঠাক বলতে পারত। একবার ভেবেছিলাম তোর মাকেও নিয়ে আসি। কুকুরে কামড়ানোর পর ওর শরীর ভালো না... এই জন্যেই আনি নি।

বাবা প্লিজ আপনি চলে যান। আমি আপনার পায়ে পড়ছি।

আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি। যাচ্ছি। বৌমাকে একবার দেখে যাব না? কখনো দেখি নি।

আচ্ছা যান দেখে যান–ও শুয়ে আছে। ওব সঙ্গে ইচ্ছা করলে কথাও বলতে পারেন। ও এখনো মরে নি, কথা বলে হাঁটে পানি খায়...

গলায় বালিশ চেপে ধরে রাখলে কেউ কি আর বেঁচে থাকে রে বোকা? তুই যা দেখছিস সব মনের কল্পনা। মনের বিকার। তোর স্নায়ু ভয়ঙ্কর উত্তেজিত। এই জন্যেই তোকে নিয়ে এত চিন্তা লাগছে।

আমাকে নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না। আমি ভালো আছি। খুব ভালো আছি। আপনি চলে গেলে আরো ভালো থাকব। যান। আপনার বৌমাকে দেখে চলে যান।

ওর গায়ে একটা কাপড় পরিয়ে দে বাবা। সুন্দর একটা শাড়ি পরিয়ে দে। ছেলের বৌ প্রথম দেখছি। ওর বিয়ের শাড়িটা আছে না?

হুঁ আছে।

বিয়ের শাড়িটা পরা, আর কিছু গয়না টয়না পবিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দে। আমি মাকে দেখে চলে যাই।

বাবা আমি এইসব কিছুই করব না।

বাবা, তীব্র গলায় বললেন, তুই অবশ্যই কববি। আমি আমার বৌমার নগ্ন মূর্তি দেখব?

আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। এটা স্বপ্ন হতে পারে না। স্বপ্নে এমন তীব্র গলায় কেউ কথা বলে না। স্বপ্ন এত দীর্ঘ ও হয় না। এটা উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনাও না। উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা এত গোছানো হয় না। তাহলে কী হচ্ছে?

খোকন!

জি বাবা।

বৌমাকে বস্তায় ভরে রাস্তায় ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না। তোর মা মনে কষ্টে পাবে।

মা তো বেঁচে নেই বাবা।

বাবা বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন। আমি সেই হাসি দেখে চমকে উঠলাম। তার নিজের মৃত্যুর সময়ও তিনি ঠিক এই ভাবে হেসেছিলাম। মৃত্যুর সময় তিনি আমাদের সবাইকে লাইন বেঁধে দাড়া কবালেন। আমাদের প্রত্যেকের মাথায় হাত রেখে খানিকক্ষণ দেয়া করলেন। তারপর বিচিত্র ভঙ্গিতে খানিকক্ষণ হেসে মারা গেলেন।

খোকন।

জি বাবা।

বৌমাকে রাস্তায় ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না বাবা।

আপনি কী করতে বলেন?

তুই বৌমার বাবা-মাকে খবর দে। তোর বন্ধু ওসি সাহেবকে টেলিফোন করে সব খুলে বল।

পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।

বাবা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তা হয়তো দিবে। কী আর করা।

বাবা, ফাঁসিতে ঝুলতে আমার ভয় লাগবে।

ভয়ের কী আছে। ভয়ের কিছু নেই। মানুষের প্রধান কাজ হলো ভয়কে জয় করতে শেখা।

আপনি আমাকে বলছেন পুলিশকে খবর দিতে?

হ্যাঁ।

আমি যদি তা করি আপনি কি আমাকে আগের মতো ভালোবাসবেন?

তুই পুলিশকে কিছু না বললেও তোকে আগের মতো ভালোবাসব। ছেলে-মেয়ে ভালো কি মন্দ বাবা-মার ভালোবাসা তার ওপর নির্ভর করে না রে বোকা।

আপনি কি সত্যি বলছেন বাবা?

হ্যাঁ সত্যি বলছি। আরেকটা সত্যি কথা শুনে যা–বৌমা তোকে ভয়ঙ্কর ভালোবাসতো। তোর মা আমাকে যতটা ভালোবাসতো বৌমা তোকে ঠিক ততটাই ভালোবাসতো। তোর মার ভালোবাসা অপাত্রে পড়ে নি, কিন্তু আমার বৌমার ভালোবাসা পড়েছিল অপাত্রে।

বাবার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। তিনি তার ময়লা মাফলারে চোখ মুছছেন।

আমি বললাম, বাবা আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি আপনার বৌমাকে বিয়ের শাড়ি পরিয়ে আপনাকে খবর দেব।

আচ্ছা।

আব আমি আপনি থাকতে থাকতেই পুলিশকে খবর দেব।

গুড।

আপনি কি সত্যি এসেছেন। বাবা?

বাবা হাসলেন।

আমি সুন্দর করে রুবাকে সাজালাম। শাড়ি পরালাম। গয়না পরালাম। রুবা কোনো নড়াচড়া করল না, কোনো শব্দও করল না। যে মৃত্যুর জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলামসেই মৃত্যু তার ঘটেছে। আমি রুবার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম— রুবা, আমার বাবা তোমাকে দেখতে এসেছেন।

রুবা তার উত্তরেও কিছু বলল না।

রুবাকে সাজানো শেষ করে বসাব ঘরে এলাম। বাবা নেই। থাকবে না। আমি জানতাম। আমার মাথা যে ভ্রান্তি তৈরি করেছিল সেই ভ্রান্তি দূর হয়েছে।

আমি শোবার ঘরে ঢুকে থানায় টেলিফোন করলাম। শান্ত ভঙ্গিতে ওসি সাহেবকে বললাম, ওসি সাহেব আমি ভয়ঙ্কর একটা অপরাধ করেছি। আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি। আসুন, আপনি আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান।

রুবার হাত ধরে আমি বসে আছি। কী অসম্ভব কোমল তার হাত।

রুবা কান্ত হয়ে শুয়ে আছে। বেনরসিতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে রুবাকে। ওকে একটু কাজল পরালে হয় না? কোথায় আছে কাজলদানী?

দরজার ওপাশ থেকে আমাকে চমকে দিয়ে বাবা বললেন–ড্রয়ারে আছে রে খোকন। ড্রয়ারটা খোল।

তিনি তাহলে এখনো যান নি? এখনো আছেন? আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল।

আমি রুবাকে কাজল পরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

আকাশে চাঁদ আছে। বারান্দায় চাঁদের ক্ষীণ আলো। এটা কি রুবার সেই বিখ্যাত পঞ্চমীর চাঁদ? কখন ডুববে পঞ্চমীর চাঁদ?